অগ্রযাত্রার দশ বছর

(২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮)

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অগ্রযাত্রার দশ বছর (২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮)

অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অগ্রযাত্রার দশ বছর
(২০০৯-২০১৮)

অক্টোবর, ২০১৮

অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অগ্রযাত্রার দশ বছর

প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে 'অগ্রযাত্রার দশ বছর' পুস্তিকা রচিত হয়েছে। তথ্য-উপাত্তের মধ্যে কিছু তথ্য সাময়িক, যা পরবর্তীতে সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করা হবে।

যোগাযোগ

পুস্তিকা সম্পর্কিত যাবতীয় যোগাযোগ এর জন্য:

অতিরিক্ত সচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

টেলিফোন: +৮৮-০২-৯৫১১৮৬০; ই-মেইল: mew@finance.gov.bd

পুস্তিকার কপি অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট www.mof.gov.bd থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।

প্রচ্ছদ: রাবেয়া পারভীন, ক্রিয়েটিভ আইডিয়া

মুদ্রণ: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

মুখবন্ধ

দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে এবং 'রূপকল্প ২০২১'-কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের অভিযাত্রা শুরু হয়। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা-তাড়িত সরকারের এ অভিযাত্রার অন্যতম অংশীদার ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়। রূপকল্পের আলোকে দেশের মানুষের জীবনমানে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সরকারের দুই মেয়াদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিভাগ নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করেছে।

সরকার পরিকল্পিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০০৭ থেকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার দীর্ঘায়িত প্রভাব ও সময়ে সময়ে উদ্ভুত দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছে। দেশে ধারাবাহিকভাবে ও উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং দ্রুততার সাথে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় তিন ধাপ অগ্রসর হয়েছে। ১৮৯টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান বর্তমানে ১৩৬। ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে কম মাথাপিছু আয় নিয়েও বাংলাদেশ সামাজিক সূচকসমূহ, বিশেষ করে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল, স্বাক্ষরতার হার, শিশুমৃত্যু হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। রাজস্ব ও মুদ্রানীতির যথাযথ সমন্বয়, অর্থনীতির সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা (Aggregate Fiscal Discipline) ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এ অগ্রযাত্রায় অর্থ মন্ত্রণালয় নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেটের আকার ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭ গুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়েছে। বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করলেও কার্যত তা অমূলক প্রমানিত হয়েছে। বরং বর্ধিত সরকারি ব্যয় ও তার বন্টনে দক্ষতা ও উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাফল্যের অনুকরণীয় নজির স্থাপন করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে গড়ে ৬.৪ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে, বিগত তিন অর্থবছরে একাদিক্রমে সাত শতাংশের অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। ইতোমধ্যে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে যথাক্রমে ২১.৮ ও ১১.৩ শতাংশে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুই মেয়াদে দশ বছরের ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলেই এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয় যে কৌশল ও সুচিন্তিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সামষ্টিক অর্থনীতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি, আর্থিক খাতের সুচারু ব্যবস্থাপনা

ইত্যাদি। সুবিবেচনাপ্রসূত ও বাস্তবানুগ নীতি ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এ গুরুদায়িত্বটি অর্থ মন্ত্রণালয় দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি-কৌশলসমূহের আলোকে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকৃতির সাথে সম্পৃক্তকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা হয়েছে।

বাজেটে অর্থায়ন এবং তার বাস্তবায়ন কাজটিকে যৌক্তিক ও অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে সকল মন্ত্রণালয়কে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে খাতভিত্তিক নীতি ও কৌশলের সাথে সকল কাজের সামঞ্জস্য এবং যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও করদাতাবান্ধব পরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক, বিধি ও কাঠামোগত ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। ফলে, কর রাজস্ব আহরণ জোরদার হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রক ও সহায়ক তিনটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিশালী করে আর্থিক খাতকে একটি স্থিতিশীল ও উন্নত অবস্থানে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকিং সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংকের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১০,১১৪ টিতে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে।

দেশের জনগণের নিকট সরকারের জবাবদিহিতার বোধ থেকেই এ প্রকাশনায় বিগত দশ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিভাগভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিগত এক দশকের কর্মকান্ডের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব না হলেও কর্মযজ্ঞের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন বিভাগসমূহ স্ব স্ব তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তথ্য সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার শ্রমসাধ্য কাজটি নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করায় অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস, প্রকাশনাটি সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হবে এবং সরকারের কাজের যথাযথ মুল্যায়ন করতে সহায়ক হবে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অগ্রযাত্রার দশ বছর

এক দশকের পথ পরিক্রমা ১

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ৯

১.০ অর্থ বিভাগ ১১

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ১১

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন ১৩

প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক খাতে অর্থায়ন ১৪

দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক সূচকের উন্নয়ন ১৬

কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা ১৮

কর্মসৃজন ও দক্ষতা উন্নয়ন ১৯

কর্মচারী কল্যাণ ২০

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার ২১

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগ ২২

সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন ২২

জলবায়ু অর্থায়ন ২৩

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২৫

২.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২৭

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারমূলক কার্যক্রম ২৭

আইন ও বিধি সংস্কার ২৭

জনবলের পুনর্বিন্যাস ২৮

শুল্ক ও কর কাঠামোর সংস্কার (প্রযুক্তিগত কৌশলের পরিবর্তন) ২৯

মূসক বিভাগের সংস্কার ২৯

কাস্টমস বিভাগের সংস্কার ৩০

আয়কর বিভাগের সংস্কার ৩১

সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রয়াস ৩২

সার্বিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম ৩২

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আধুনিকায়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০১৬ ৩২

রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ৩৩

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় ৩৩

সার্বিক রাজস্ব আদায় ৩৪

কর আরোপ ও আদায় পরিবেশ ৩৪

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সংস্কারমূলক কার্যক্রম ৩৫

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর-এর সংস্কারমূলক কার্যক্রম ৩৫

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে আহরিত সম্পদের বিবরণী ৩৭

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়		৩৯
৩.০	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৪১
	ব্যাংক খাত সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪২
	মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা	৪২
	আর্থিক খাত সংস্কার	৪৪
	ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট	৪৪
	রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৪৫
	পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর অগ্রগতি	৪৬
	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৪৭
	মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার	৪৮
	মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ	৪৮
	রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের মানোন্নয়ন	৪৯
	উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ ও উদ্যোক্তা গঠন	৫০
	পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫১
	ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ তথ্য	৫২
	ব্যাংক খাতের ঋণের মোট আগাম ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন	৫৩
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা এবং বিশেষ কার্যক্রম	৫৩
	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫৪
	বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫৪
	পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫৬
	আইনী সংস্কার	৫৬
	নতুন নীতিমালা প্রণয়ন	৫৭
	প্রশাসনিক সংস্কার	৫৮
	বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬২
	পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগে অর্থায়ন	৬৩
	ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬৪
	নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬৭
	বিশেষায়িত ব্যাংক/কর্পোরেশনের কার্যক্রম	৬৭
	আর্থিক প্রণোদনা	৬৮
	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্ভাবণী কার্যক্রম	৬৮
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়		৬৯
৪.০	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৭১
	বৈদেশিক সহায়তা	৭১
	বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ	৭১
	বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ	৭৩
	প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার	৭৫

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা ৭৬
ঋণ পরিশোধ ৭৭
ঋণ ধারণক্ষমতা ৭৮
এনজিও কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য ৭৯
যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্র প্রণয়ন ৭৯
বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশন ৮০
Asian Infrastructure Investment Bank এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যপদ লাভ ৮০
অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য টাস্কফোর্স গঠন ৮০
Green Climate Fund এর National Designated Authority ৮১
Global Partnership for Effective Development Cooperation এর সদস্যপদ লাভ ৮১
স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন ৮২
বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম আয়োজন ৮২
লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ গঠন ৮২

চিত্র তালিকা

চিত্র ৩.১ ব্যাংক খাতের সেক্টরভিত্তিক ঋণ ৫৩
চিত্র ৩.২ পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সুবিধা প্রদান ৫৯
চিত্র ৩.৩ BSEC এর নুতন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, ২০১৩ ৬০
চিত্র ৩.৪ BSEC কর্তৃক IOSCO এর MoU স্বাক্ষর, ২০১৪ ৬২
চিত্র ৩.৫ BSEC এর Financial Literacy কার্যক্রমের উদ্বোধন, ২০১৭ ৬৩
চিত্র ৪.১ বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্টের মধ্যে অনুদান ও ঋণের হার, ২০০৫-০৬ হতে ২০১৭-১৮ ৭২
চিত্র ৪.২ বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট, ২০০৫-০৬ হতে ২০১৭-১৮ ৭২
চিত্র ৪.৩ ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে অনুদান ও ঋণের হার, ২০০৫-০৬ হতে ২০১৭-১৮ ৭৩
চিত্র ৪.৪ বৈদেশিক সাহায্যের ছাড়করণ, ২০০৫-০৬ হতে ২০১৭-১৮ ৭৪
চিত্র ৪.৫ উৎস অনুযায়ী বৈদেশিক সহায়তা ছাড়করণের হার (২০১৭-১৮) ৭৪
চিত্র ৪.৬ প্রধান প্রধান উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক বৈদেশিক সাহায্যের ছাড়করণ, ২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ ৭৫
চিত্র ৪.৭ এডিপি বরাদ্দ ও প্রকল্প সাহায্য, ২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ ৭৫
চিত্র ৪.৮ সর্বাধিক প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত, ২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ ৭৬
চিত্র ৪.৯ ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার খাতভিত্তিক পরিমাণ ৭৭
চিত্র ৪.১০ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ও স্থিতি ৭৮

সারণি তালিকা

সারণি ১.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচকের অবস্থান ১২
সারণি ১.২ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান ১৮

সারণি ২.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় ৩৩
সারণি ২.২ বিদ্যমান জাতীয় সঞ্চয় স্কীম ৩৫
সারণি ৩.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ ৪১
সারণি ৩.২ তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদের হারের চিত্র (ভারিত গড় %) ৪৩
সারণি ৩.৩ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ৪৭
সারণি ৩.৪ মানি লন্ডারিং/সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অর্থায়ন প্রতিরোধে অবস্থান ৪৯
সারণি ৩.৫ বিভিন্ন পুন:অর্থায়ন তহবিল ৫১
সারণি ৩.৬ ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ তথ্য ৫২
সারণি ৩.৭ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ ৫৪
সারণি ৩.৮ পুঁজিবাজার খাতে প্রধান বাজার নির্দেশকসমূহের প্রবৃদ্ধি ৬১
সারণি ৩.৯ পুঁজিবাজারে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা ৬২
সারণি ৩.১০ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ৬২
সারণি ৩.১১ কোম্পানি কর্তৃক আইপিও-র মাধ্যমে পুঁজিবাজার হতে মূলধন উত্তোলনের প্রতিবেদন ৬৩
সারণি ৩.১২ গত ১০ বছরে বিএমডিএফ আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত পূর্ত কাজ ৬৬
সারণি ৪.১ পাবলিক সেক্টরে বৈদেশিক ঋণের সূচক ৭৮

পরিশিষ্ট তালিকা

পরিশিষ্ট ১ খাতভিত্তিক মোট ব্যয় ৮৫
পরিশিষ্ট ২ খাতভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয় ৮৬
পরিশিষ্ট ৩ বাজেট ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস ৮৭
পরিশিষ্ট ৪ ভর্তুকি ও সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ ব্যয় ৮৮
পরিশিষ্ট ৫ ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাঠামো: খাতভিত্তিক অবদান (%) ৮৯
পরিশিষ্ট ৬ রপ্তানি ও আমদানির বিবরণী ৯০
পরিশিষ্ট ৭ রাজস্ব আয় ৯১
পরিশিষ্ট ৮ জাতীয় সঞ্চয় স্কীমের বিনিয়োগ বিবরণী ৯২
পরিশিষ্ট ৯ বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও ডিসবার্সমেন্ট ৯৩
পরিশিষ্ট ১০ খাতভিত্তিক বৈদেশিক সহায়তা, ২০০১-০২ থেকে ২০১৭-১৮ ৯৪
পরিশিষ্ট ১১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ, ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ ৯৫
পরিশিষ্ট ১২ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সর্বাধিক প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত, ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ ৯৬
পরিশিষ্ট ১৩ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ৯৭
পরিশিষ্ট ১৪ বেসরকারি সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা ৯৮

এক দশকের (২০০৯-২০১৮) পথ পরিক্রমা

২০২১ সালে পূর্ণ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশতক। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল বর্তমান সরকার। উপর্যুপরি দুই মেয়াদে প্রায় দশ বছর দেশ পরিচালনায় সরকার দক্ষতা ও সাফল্যের অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়, অতঃপর বাংলাদেশ

০২। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট আমাদের সকলেরই জানা আছে। জানা আছে কতখানি মূল্য দিতে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল আজন্ম লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর অঙ্গীকার, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নিঃস্বার্থ অবদানের কথা বাঙ্গালি জাতির স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে থাকবে চিরকাল। তাঁর নেতৃত্বে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সূচিত হয়েছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ এবং উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা। কিন্তু সূচনালগ্নেই কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে সে অভিযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। তাদের নির্মমতা ও নৃশংসতার শিকার হন বঙ্গাবন্ধু আর তাঁর পরিবারের সদস্যগণ। জাতির ভাগ্যে নেমে আসে অন্ধকার ও অনিশ্চয়তা।

০৩। বাঙ্গালি জাতির সৌভাগ্য যে, সময়ের পরিক্রমায় উন্নয়ন অভিযাত্রাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার মহান দায়িত্ব তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি জননেত্রী শেখ হাসিনার ওপর বর্তায়। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও গর্বিত উত্তরাধিকার ধারণ করে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে উন্নয়নের নতুন ধারা সূচনা করে। কিন্তু, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থানে তাতেও অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতির অবসান ঘটে ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে। দেশের মানুষের অবিচল আস্থা আর নিরঙ্কুশ সমর্থন নিয়ে 'দিন বদলের সনদ' তথা 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের পথে পুনরায় যাত্রা শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। বস্তুত, 'রূপকল্প ২০২১' এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দীর্ঘমেয়াদি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জনগণের প্রকৃত প্রত্যাশারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সরকার গঠনের পর নির্বাচনী ইস্তেহার 'রূপকল্প ২০২১' রূপান্তরিত হয় 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' এ। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের উপর্যুপরি দুই মেয়াদে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এখনও চলমান রয়েছে।

০৪। নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সাথে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে বৈশ্বিক সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট (Milleneum Development Goals) অর্জনের ক্ষেত্রেও। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals (SDGs) নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল বাংলাদেশের। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করে এসডিজি বাস্তবায়নের কাজও শুরু করা হয়েছে।

এক দশকের পথচলা: অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা

০৫। বিগত এক দশকে সরকারের পথ চলা মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যাত্রা শুরুর সময়টাতেই বিশ্ব ছিল মন্দার অভিঘাতে পর্যুদস্ত, যা দীর্ঘায়িত হয়েছে অনেকটা সময়। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে ছিল বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামোর অপ্রতুলতা ও জনমুখী নীতি-কৌশলের অনুপস্থিতি। এছাড়া সময়ে সময়ে জঙ্গিবাদ, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাততো ছিলই। দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের অভিঘাতসহ সকল বাধা সাফল্যের সাথেই মোকাবেলা করেছে বাংলাদেশ।

০৬। রপ্তানি খাতে প্রণোদনা প্রদান, কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণে বিভিন্ন কার্যব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানি বেড়েছে ৩.৫ গুণ। একই ভাবে, কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রসার, অভিবাসন ব্যয় হ্রাসকরণ, অভিবাসন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজশর্তের ঋণের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ অভিবাসনের জন্য আইনি কাঠামো তৈরি করা, শ্রমবাজার সম্প্রসারণে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদারকরণ, আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ ইত্যাদির ফলে এসময়ে প্রবাস আয় ৩.১ গুণ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের উচ্চ প্রবাহ বহিঃখাতে সার্বিক স্বস্তি অব্যাহত রাখে, গড়ে উঠে বৈদেশিক মুদ্রার সন্তোষজনক মজুত এবং স্থিতিশীল থাকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৯.৪ গুণ বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ৩২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

০৭। উচ্চ হারে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ৫.৬ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। শুধু বিনিয়োগ বাড়ানোই নয়; এসময়ে সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারের উৎকর্ষ ছিল নজর কাড়ার মত। বন্টনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয় ভৌত অবকাঠামো (বিদ্যুৎ-জ্বালানি, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি) ও মানব সম্পদ গঠন (শিক্ষা-স্বাস্থ্য-দক্ষতা উন্নয়ন) এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর। একই সাথে গুরুত্ব পায় কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি। কার্যত, সরকারি বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য ছিল অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে বেসরকারি খাতের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর প্রভাবে মোট বিনিয়োগ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৬.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.২ শতাংশ হয়েছে।

০৮। সরকারের লক্ষ্যভিত্তিক বর্ধিত বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতের সক্রিয়তায় দেশব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে, সক্রিয় হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের কর্মসৃজন ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশে ও বিদেশে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে কাজের সুযোগ বেড়েছে। সার্বিকভাবে, ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং

২০০৫-০৬ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৭৯ লক্ষ কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য আর বিদেশ থেকে আসা প্রবাস আয় অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতিকে সচল করেছে। এক দশককাল ধারাবাহিকভাবে গড়ে ছয় শতাংশের বেশি হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে, বিগত তিন অর্থবছরে একাদিক্রমে সাত শতাংশের অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। ইতোমধ্যে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, বিগত দশ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা তথা ভোগ ও বিনিয়োগের অবদান ক্রমশ বেড়েছে।

০৯। গর্বের বিষয় হচ্ছে, ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য থাকলেও ২০১৫ সালেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটেছে এবং ২০১৮ তে এসে পূরণ হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার সকল শর্ত। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের তিনটি শর্তই (মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে নির্ধারিত মান অর্জন) একসাথে পূরণ হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল এবং জনগণের জীবনমানের পরিবর্তন

১০। মূল্যস্ফীতি জনগণের জীবনমানে সরাসরি প্রভাব ফেলে। আর তাই মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় রাখার দিকে সরকারের সার্বক্ষণিক নজর ছিল। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.২ শতাংশ[১]। এছাড়া বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবছর ২০০৭-০৮ সময়ে মূল্যস্ফীতি ছিল ১২.৩ শতাংশ। দক্ষ রাজস্ব ও মুদ্রানীতির প্রয়োগে উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রশমন করা সম্ভব হয়। সর্বশেষ আগষ্ট, ২০১৮ সময়ে মূল্যস্ফীতি ৫.৪ শতাংশে (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) নেমে আসে। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় মজুরি ও আয় বেড়েছে। এছাড়া, জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০০৫ ও ২০১৫ সালে দু'টি জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করায় সরকারি কর্মচারীগণের জীবনমানেও গুণগত পরিবর্তন এসেছে। অন্যদিকে, কাঠামোগত কারণে যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে থেকেছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ নানামুখী আয় হস্তান্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল তাদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছে। দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্তদের সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ বহুলাংশে বাড়ানো হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা হতে ৪.৬ গুণ বাড়িয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের প্রভাবে সামাজিক চলকসমূহে সমমানের দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।

[১] ভিত্তিবছর ১৯৯৫-৯৬

১১। সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনা। বাস্তবে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে আরো দ্রুততার সাথে। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ছিল যথাক্রমে ৪০.০ ও ২৫.১ শতাংশ। ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ ও চরম দারিদ্র্যের হার ১২.৯ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমানে ২০১৮ সালে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যে হার আরো কমে হয়েছে যথাক্রমে ২১.৮ ও ১১.৩ শতাংশ[২]। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল- দেশের জনগণের সার্বিক সক্ষমতা বাড়ায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি আয় হস্তান্তরের পরিধিও (জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম) বিস্তৃত হয়েছে। ফলে, অসমতা হ্রাস পেয়েছে; ভোগ গিনি সূচক ২০০৫ সালের ০.৩৩২ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ০.৩২৪। বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়লেও বাংলাদেশে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কমেছে অনেক দ্রুত হারে। Global Hunger Index এ বাংলাদেশের স্কোর ২০০৭ সালের ২৮.৪ থেকে ২০১৭ সালে ২৬.৫ এ নেমে এসেছে। অথচ, প্রতিবেশী ভারতের ক্ষেত্রে একই সূচকে স্কোর ২০০৭ সালে ছিল ২৫.৩, যা ২০১৭ সালে বেড়ে হয়েছে ৩১.৪।

মানব উন্নয়নে ভিন্ন মাত্রায় বাংলাদেশ

১২। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ বিগত দশ বছরে অনেক দূর এগিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হওয়া, ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাওয়া, শিক্ষার সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা সৃষ্টির মত সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বাস্থ্যসেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে এবং টিকাদান কর্মসূচির আওতায় এসেছে প্রায় সকল শিশু। নবজাতক (এক বছরের কম বয়সি) ও শিশু (পাঁচ বছরের কম বয়সি) মৃত্যুর হার এবং মাতৃ মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে।

১৩। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মানব উন্নয়নে বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্জন সমমানের অন্যান্য দেশের তুলনায় ছিল অনেকটাই ভিন্ন মাত্রার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনমান এ তিনটি নির্দেশকের ভিত্তিতে জাতিসংঘের তৈরি করা মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে চার ধাপ এগিয়েছে। একই সময়ে ভারত ও পাকিস্তান যথাক্রমে দুই ও চার ধাপ পিছিয়েছে। ‘মানব উন্নয়ন সূচকে’ ২০০৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৭ টি দেশের মধ্যে ১৪০তম। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান দাঁড়িয়েছে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ১৩৬তম। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মান ২০০৫ সালের ০.৫৪৭ হতে বেড়ে ২০১৭ সালে ০.৬০৮ এ দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ সময়কালে ভারত ও পাকিস্তানে মানব উন্নয়ন সূচকের মান বেড়েছে যথাক্রমে ৩.৪ ও ২.০ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মান বেড়েছে ১১.২ শতাংশ।

[২] প্রাক্কলিত

১৪। লক্ষ্য করার বিষয় হল- ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক কম মাথাপিছু আয় নিয়েও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সামাজিক সূচকসমূহে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অগ্রসর হতে পেরেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছর, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানে গড় আয়ুষ্কাল যথাক্রমে ৬৮.৮ ও ৬৬.৬ বছর। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৫ সালের ৩৬ জনের তুলনায় ২০১৭ সালে ৩১ জনে নেমে এসেছে; এক বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যু হার ২০০৫ সালের ৪৮ জন হতে ২০১৭ সালে ২৪ জনে নেমে এসেছে। মাতৃ-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৫ সালের ৩.৪৮ হতে ২০১৭ সালে ১.৭২ এ নেমে এসেছে। অন্যদিকে, ২০১৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যু হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৮.৮ ও ৪৩ জনে এবং এক বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর হার হয়েছে ভারতে ৩৪.৬ এবং পাকিস্তানে ৬৪.২।

১৫। একইভাবে, শিক্ষা খাতে জিডিপি'র অনুপাতে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বেশ কম বরাদ্দ নিয়েও বাংলাদেশ অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৮ অনুসারে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৭২.৮ শতাংশ; ভারত ও পাকিস্তানে এ হার যথাক্রমে ৬৯.৯ ও ৫৭.০ শতাংশ।

নারীর ক্ষমতায়ন: অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ

১৬। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রার অন্যতম অংশীদার করে তোলার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার শুরু থেকেই সুস্পষ্ট ছিল। 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১০' সহ সরকারের সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নারী-শিক্ষার প্রসার, শিক্ষা ও কর্মে নারীর সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, সহজ শর্তের ক্ষুদ্রঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, অসহায়-অবহেলিত-প্রতিবন্ধী নারী ও দরিদ্র কর্মজীবী মা'দের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনয়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনি কাঠামো প্রণয়ন, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে নারীর সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নারীরা ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সক্রিয় ও আনুষ্ঠানিক অংশীদার হয়ে উঠছে।

১৭। কর্মরত নারীর সংখ্যা ২০০৫ সালের ১ কোটি ১৩ লক্ষ হতে বেড়ে ২০১৬-১৭ সালে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ হয়েছে। 'The Global Gender Gap Report' অনুসারে 'জেন্ডার বৈষম্য' সূচকে ২০১৭ সালে ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে ৪৭তম, যেখানে ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ১০৮, ১০৯, ১১১, ১২৪ ও ১৪৩। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে এ সূচকে ১৩৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮২তম। জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ বর্তমানে শীর্ষ অবস্থানে আছে। বিশেষ করে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্তির বিচারে বাংলাদেশের

অবস্থান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র (৪৯তম), অষ্ট্রিয়া (৫৭তম), সিঙ্গাপুর (৬৫তম), জাপান (১১৭তম) ব্রাজিল (৯০তম), চীন (১০০তম) এর মত উন্নত দেশসমূহ জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

এক দশকের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা

১৮। গত দশ বছরে সরকারের নীতি-কৌশল সাদরে গ্রহণ করে দেশের জনগণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে। জনগণকে নিরাশ করেনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার। বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে, প্রথাগত তত্ত্ব ও ধ্যানধারণাকে পেছনে ফেলে বিগত এক দশকে বাংলাদেশ এগিয়েছে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ২০১৫ সালে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে মধ্যম আয়ের দেশে। ২০১৮ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে উন্নয়নের আরো এক নতুন অধ্যায়। আজকের বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক খাতের উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন ঘটছে একই সমান্তরালে। আজকের বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী প্রথম দশটি দেশের একটি। বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সমমানের দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাবমতে নামিক (nominal) জিডিপি'র ভিত্তিতে ৪৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ আর ক্রয় ক্ষমতার সমতার (Purchasing Power Parity) ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান ৩২তম।

১৯। গুরুত্বপূর্ণ সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট বিশেষ করে, দারিদ্র্য ও অসমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বে নজির হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'Millennium Development Goals' পুরস্কারে ভূষিত হন। দারিদ্র্য বিমোচনে অভাবনীয় সাফল্যের জন্য পেয়েছেন 'Achievement in Fighting Poverty' পুরস্কার, নারীর অধিকার সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের কারণে 'Plannet 50-50 Champion' এবং 'Agent of Change' অভিধা মিলেছে। ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অভিষিক্ত হয়েছেন 'Global Women's Leadership' সম্মাননায়। শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সাধারণ মানুষের জীবনমানে অসাধারণ ভূমিকা রাখার জন্য ভারতের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভূষিত করেছে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে।

২০। অভিবাসী বিরোধী চলমান বৈশ্বিক ভাবধারার বাইরে এসে মায়ানমারের নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার শিকার বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত দশ লক্ষ রোহিঙ্গা অধিবাসীকে আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানের সৎসাহস শেখ হাসিনার সরকারের পক্ষেই দেখানো সম্ভব হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলমান রাখার সমান্তরালে অব্যাহত মানবিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি অভিভূত করেছে বিশ্ববাসীকে; জননেত্রী শেখ হাসিনা পরিচিত হয়েছেন 'Mother of Humanity' হিসেবে।

এক দশকের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রা: অর্থ মন্ত্রণালয়ের অংশীদারিত্ব

২১। সরকারের দশ বছরের পথপরিক্রমা ও অর্জনের এক অপরিহার্য অংশীদার ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়। বস্তুত সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণসঞ্চারী অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্বটি পালন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের চারটি অংশ – অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ। বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টায় বিগত দশ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিভাগ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনুকূল ধারা বজায় রাখতে এ সময়ে মন্ত্রণালয়নাধীন প্রতিটি বিভাগ[৩] স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নসহ সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদন করেছে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে।

২২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অংশ অর্থ বিভাগ। রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে অর্থ বিভাগ দক্ষতার অনন্য স্বাক্ষর রেখেছে। অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোর শৃঙ্খলা (Aggregate Fiscal Discipline) বজায় রাখা; সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ও পরিকল্পনা কমিশনের সম্পৃক্ততায় ব্যয় চাহিদা প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা ছিল অর্থ বিভাগের। পরিবর্তনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেটের আকার প্রতি বছর বাড়ানো হয়েছে। বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা ও সম্পদের অপ্রতুলতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন, কালক্রমে সে সংশয় অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। বাজেট ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; রাজস্ব, মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা; আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং জনসেবায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগে অর্থ বিভাগের সুবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড অভাবনীয় সাফল্য এনেছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনানুগ সম্পদ প্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থ বিভাগ সরকারের ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনার কাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে। ফলে, বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে সন্তোষজনক ঋণমান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

২৩। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যা সরকারি আয় প্রবাহের অন্যতম ক্রীড়নক। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পদ জোগাতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ আয়কর, মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য উৎস হতে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এনবিআর রাজস্ব আদায় ছিল জিডিপি'র মাত্র ৬.৭ শতাংশ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা উন্নীত হয়েছে জিডিপি'র ৯.১৭ শতাংশে।

[৩] কার্যবিধি ১৯৯৬ অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের অংশ হলো অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ। পরবর্তীতে ২০১০ সালে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নামে আরো একটি বিভাগ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে সম্প্রতি 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' নামকরণ করা হয়েছে।

২৪। উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহজ শর্তের বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আরেক অংশ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তৎপরতা ছিল প্রশংসনীয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিপূরক হিসেবে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তা ও ঋণের সময়ানুগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে আসছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ। এ বিভাগের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সর্বাধিক বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিলেছে এবং বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ও হয়েছে অনেক বেশি।

২৫। আর্থিক খাতের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা তথা বাংলাদেশ ব্যাংক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। মুদ্রা-আর্থিক-বীমা খাত ও পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ বিধিবিধান প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে জনবল সংকট নিরসনসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধান এবং আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদনের কাজও করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। এছাড়া, আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিপূরক হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সংশ্লিষ্টতায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও উৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রবাহ সুনিশ্চিত হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ব্যাংকের শাখার বিস্তৃতি, মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিসর ব্যাপৃত হয়েছে, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সাবলীলতা বজায় রয়েছে।

সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রা

২৬। আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রার যে মজবুত ভিত ইতোমধ্যে রচিত হয়েছে, তার পেছনে নেতৃত্ব ও অনুসৃত কর্মকৌশলের ধারাবাহিকতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এক দশকের অর্জনকে আরো শানিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্য স্থির করেছে সরকার। সুদূরপ্রসারী ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১’ প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে দেশের অমূল্য পানি-সম্পদের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপসহ সকল খাতের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি ‘বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ যা ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে।

২৭। সরকারের প্রত্যাশা ও বিশ্বাস - দেশের জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা সামনের দিনগুলিতেও বজায় থাকবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ।

অর্থ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

১.০ অর্থ বিভাগ

রাষ্ট্রের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার (fiscal management) দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির সার্বিক গতিধারা মূল্যায়নপূর্বক সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ; রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং তার সাথে মুদ্রানীতি ও বিনিময় হার নীতির সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনীতির সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা (Aggregate Fiscal Discipline) বজায় রাখা; মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জাতীয় বাজেট প্রস্তুত করা ও সরকারের অগ্রাধিকারের আলোকে বিভিন্ন খাতে সম্পদের চাহিদা ও ফলাফলভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান; ট্রেজারি ও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা; সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সরকারি ব্যয়ের যথাযথ ব্যবস্থাপনা অর্থ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া, এ বিভাগ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন এবং আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীও সম্পাদন করে থাকে। অধিকন্তু, সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করে অর্থ বিভাগ। আর্থিক খাত সংস্কারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে সরকারি আর্থিক সেবা সহজে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

১.১ সার্বিকভাবে অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হল-

- দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিতকরণ
- দারিদ্র্য নিরসন ও অসমতা হ্রাস
- সরকারি সম্পদের অগ্রাধিকারভিত্তিক বন্টন
- সরকারি সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
- সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ঋণ ধারণ সক্ষমতা বজায় রাখা
- বেসরকারি বিনিয়োগ এবং রপ্তানি খাত বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গঠনে সহায়তা প্রদান।

১.২ বিগত দশ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্থ বিভাগের উল্লেখযোগ্য অবদান নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল-

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

১.৩ এক দশকে অর্থ বিভাগের অবদানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কথা। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় রাজস্ব ও মুদ্রানীতি এবং মুদ্রা বিনিময় হার নীতির সমন্বয় সাধনের কাজটি করে অর্থ বিভাগ। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ, সঞ্চয়, সরকারি আয়-ব্যয়, ঘাটতি, আমদানি-রপ্তানি-প্রবাস আয়,

মুদ্রা সরবরাহ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইত্যাকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের প্রক্ষেপণসহ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework (MTMF)) প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ এর ৯(২) ধারামতে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভায় এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়। সকল পক্ষের সংশ্লিষ্টতায় প্রণীত এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। মধ্যমেয়াদে সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল (Medium Term Macroeconomic Policy Statement (MTMPS)) প্রণয়নের দায়িত্বও অর্থ বিভাগের, যা সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এর ১১ ধারা মতে বার্ষিক বাজেট এর সাথে জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়।

১.৪ বলাবাহুল্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের অর্জিত সাফল্যে এ সকল নীতি-কৌশলের যথার্থতাই প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৯-২০১৮ সময়ে দেশে ধারাবাহিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার বজায় ছিল। প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা একই সাথে বজায় রাখার জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎকর্ষ জরুরি। বিবেচ্য সময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রধান নির্দেশক মূল্যস্ফীতি, সুদের হার, বাজেট ঘাটতি এবং সরকারি ঋণ/জিডিপি অনুপাত এর অবস্থান ছিল বেশ সন্তোষজনক।

- মূল্যস্ফীতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৭.২ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ১২.৩ শতাংশ হতে কমে সর্বশেষ আগষ্ট ২০১৮ সময়ে ৫.৪ শতাংশ (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) হয়েছে
- সুদের হারের ব্যবধান ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৫.৩৮ থেকে ২০১৭-১৮ শেষে ৪.৪৫ শতাংশে নেমে এসেছে
- বাজেট ঘাটতি প্রতিবছর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপি'র পাঁচ শতাংশের নিচে সীমিত ছিল
- ঋণ/জিডিপি অনুপাত ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৪৩.৫ শতাংশ হতে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ সময়ে জিডিপি'র ৩০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

সারণি ১.১: সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচকের অবস্থান

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	মূল্যস্ফীতি	সুদের হারের ব্যবধান	বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র অনুপাতে)	ঋণ/জিডিপি অনুপাত
২০০৫-০৬	৬.৬৭	৭.২[ক]	৫.৩৮	৩.১	৪৩.৫
২০০৬-০৭	৭.০৬	৯.৪	৫.৯৩	৩.৩	৪১.৬
২০০৭-০৮	৬.০১	১২.৩	৫.৩৪	৫.০	৪০.৬
২০০৮-০৯	৫.০৫	৭.৬	৪.৮৬	৪.০	৩৯.৩
২০০৯-১০	৫.৫৭	৬.৮	৫.৩০	৩.২	৩৭.৪
২০১০-১১	৬.৪৬	১০.৯	৫.১৫	৩.৮	৩৮.০

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	মূল্যস্ফীতি	সুদের হারের ব্যবধান	বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র অনুপাতে)	ঋণ/জিডিপি অনুপাত
২০১১-১২	৬.৫২	৮.৭	৫.৬০	৩.৬	৩৭.৪
২০১২-১৩	৬.০১	৬.৮	৫.১৩	৩.৯	৩৬.৬
২০১৩-১৪	৬.০৬	৭.৪	৫.৩১	৩.৬	৩৫.০
২০১৪-১৫	৬.৫৫	৬.৪	৪.৮৭	৪.১	৩২.৩
২০১৫-১৬	৭.১১	৫.৯	৪.৮৫	৩.৯	৩১.৫
২০১৬-১৭	৭.২৮	৫.৪	৪.৭২	৩.৪	৩০.৮
২০১৭-১৮[সা]	৭.৮৬	৫.৮	৪.৪৫	৫.০[রি]	২৯.৮[রি]

সূত্র: বিবিএস, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক; ক-ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬; সা- সাময়িক; রি-সংশোধিত বাজেট

১.৫ ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দিয়ে অর্থ বিভাগ একদিকে যেমন প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়তা করেছে অন্যদিকে তেমনি কৃষিখাতে প্রণোদনা ও বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ও মুদ্রানীতির যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে, 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯' এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কেবল উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ ও বাজেট ঘাটতি আবশ্যিকভাবে জিডিপি'র পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার বিষয়ে সুদৃঢ় অবস্থান বজায় রেখেছে অর্থ বিভাগ। ফলে, জিডিপি'র অনুপাতে সরকারি ঋণের পরিমাণ ক্রমশ কমে এসেছে।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন

১.৬ সরকারের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন অর্থ বিভাগের অন্যতম কাজ। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন এসেছে। সরকারি অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরুতেই 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। প্রথাগত বাজেট কাঠামোর পরিবর্তে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এই কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হয়।

১.৭ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর ভিত্তিতে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি-কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি বছর জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। একই সাথে সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের চাহিদা ও কর্মকৃতির সাথে সম্পদ বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, সরকারি সম্পদের কাম্য ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। তদুপরি, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের উৎকর্ষতায় সরকারের বাজেট প্রণয়ন, হিসাব সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনেক সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুততর হয়েছে। সম্পদের চাহিদা/ প্রয়োজনীয়তা নিরূপনে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয়ের কাজটি করা হচ্ছে গভীর অভিনিবেশ সহকারে। কর্মকালীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এসকল কাজে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বাড়াতেও কাজ করেছে অর্থ বিভাগ।

১.৮ বাজেট প্রণয়ন ছাড়াও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে বাজেটে প্রতিশ্রুত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। তার ভিত্তিতে 'বাজেট বাস্তবায়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি' বিষয়ে ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯' অনুসারে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আনুষ্ঠানিক এই অনুশীলনের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হয়েছে।

প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক খাতে অর্থায়ন

বিদ্যুৎ খাত

১.৯ বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে ব্যয়কুণ্ঠা পরিহার করে এবং সরকারের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনানুগ সম্পদ সঞ্চালনের ওপর জোর দিয়েছে। সরকারি ব্যয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৬৪,৩৮২ কোটি টাকা হতে ৭.২ গুণ বাড়িয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক খাত, বিশেষ করে বিদ্যুৎ-জ্বালানি, যোগাযোগ ও বন্দর অবকাঠামো, তথ্য-প্রযুক্তি এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেয়ার ফলে ভৌত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা অনেকখানি দূর হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে -

- কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে ৬ গুণ;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৬.৫ গুণ; এবং
- পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ১১ গুণ।

১.১০ বিগত দশ বছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার পেছনে অর্থ বিভাগের অনবদ্য ভূমিকা ছিল। বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদের শুরুতেই বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে এবং অর্থ বিভাগের সহায়তায় বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা 'Power Sector Master Plan' প্রণয়ন করা হয়, তৈরি করা হয় বছরভিত্তিক কর্মকৌশল। এছাড়া, আবশ্যকীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মত সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের দায় পরিশোধসহ বিভিন্ন আঙ্গিকে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতের অব্যাহত উন্নয়নে বিগত দশ বছরে অর্থ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

১.১১ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ধীরে ধীরে নগদ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা কমে আসলেও শুরুর বছরগুলোতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে এ ধরণের সহায়তা মূল্যস্ফীতির ওপর যেন বাড়তি চাপ তৈরি না

করে তা নিশ্চিত করতে মূল্য সমন্বয়সহ সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অর্থ বিভাগকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। সার্বিকভাবে,

- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বাজেট বরাদ্দ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৩,৮১১ কোটি টাকা হতে ৬.৫ গুণ বৃদ্ধি করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৪,৯২১ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৫,২৪৫ মেগাওয়াট হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২০,১৩৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

১.১২ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অব্যাহতভাবে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেয়ায় এ খাতে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; নির্মিত হয়েছে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, বিশ্বরোড-বিমানবন্দর সংযোগস্থল ফ্লাইওভার, জিল্লুর রহমান (মিরপুর হতে বিমানবন্দর সড়ক) ফ্লাইওভার, বহদ্দারহাট উড়ালসেতু, হাতিরঝিল প্রকল্প, ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ককে চারলেনে উন্নীত করাসহ বেশ কিছু মাইলফলক স্থাপনা এবং সড়ক-মহাসড়ক। এসকল স্থাপনা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রুত সংযোগ স্থাপন ও যানজট প্রশমনে ভূমিকা রাখছে, বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা। পাশাপাশি, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চল, এমনকি দুর্গম পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল সেবা প্রান্তিক মানুষসহ দেশের সকল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।

- যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫,২০৬ কোটি টাকা। প্রায় ১১ গুণ বাড়িয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে এখাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয় ৫৬,৪৬৪ কোটি টাকা।

মেগা প্রকল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল

১.১৩ বর্তমানে দ্রুততার সাথে চলছে প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক দশটি মেগা প্রকল্পের কাজ। এসকল প্রকল্পে অর্থায়নসহ নানাভাবে অর্থ বিভাগের সম্পৃক্ততা রয়েছে। ভবিষ্যতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে মেগা প্রকল্পসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে:

- 'পদ্মা বহুমুখী সেতু' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগে দুরত্ব ও সময় হ্রাস পাবে, জিডিপি আনুমানিক এক শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ২৮,৭৯৩ কোটি টাকা ব্যয়সম্পন্ন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে ১৬,৭৯৫ কোটি টাকা (৫৮.৩৩%)।
- উত্তরা ফেজ-৩ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.৬ কি.মি. দীর্ঘ মেট্রো রেল লাইন-৬ বাস্তবায়নের কাজ শেষ হলে গণপরিবহণ অনেক সম্প্রসারিত হবে। জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির কাজে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৫,০৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে (২৩.০৩%);
- 'পদ্মা রেল সংযোগ সেতু'র মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। চীনের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৯,০৭৩ কোটি টাকা (২৩.১২%) ব্যয় হয়েছে;

- ‘দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুণদুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ’ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কক্সবাজারের সাথে রেলযোগাযোগ বৃদ্ধি করবে, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। এডিবি’র আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটিতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে ৩,২০৪ কোটি টাকা (১৭.৫০%);

- ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (২য় পর্যায়)’ প্রকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় উৎস হিসেবে কাজ করবে। এ প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে রাশিয়া। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে ১০,৬৩৫ কোটি টাকা (৯.৪০%);

- ‘মাতারবাড়ি আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার’ প্রকল্প হতে আসবে বিপুল পরিমাণ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ। জাইকার আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে ৪,০৯০ কোটি টাকা (১৬.৩৫%);

- এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মহেশখালীতে একটি Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। আরও একটি FSRU স্থাপনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। গ্যাসের প্রাকৃতিক উৎস ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। ফলে, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

- ভারতের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন রামপাল থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্প কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করবে। এ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১৬,০০০ কোটি টাকা, যার বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে ২৯৪.৮ কোটি টাকা;

- পায়রা বন্দর নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সমুদ্র বন্দরের সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে। এ প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে ১,১৩২ কোটি টাকা (৩৩.৩২%);

- সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০,০০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি জি-টু-জি এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী দেশ/ দাতা সংস্থা সন্ধানের প্রচেষ্টা চলমান আছে।

১.১৪ মেগা প্রকল্প ছাড়াও ২০৩০ সালের মধ্যে মোট ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১০ সালে ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন’ প্রণয়নের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রতিষ্ঠিত হলে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ রপ্তানি আয় সম্ভব হবে। এছাড়া, এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে।

১.১৫ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপন ও সম্পদ সঞ্চালনের কাজটি সুচারূভাবে সম্পন্ন করে যাচ্ছে অর্থ বিভাগ। সময়ানুগ অর্থায়ন নিশ্চিত হওয়ার ফলে উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক সূচকের উন্নয়ন

১.১৬ সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি-কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের উন্নয়ন ও দক্ষতাবর্ধক প্রশিক্ষণ খাতে প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ফলে, জনগণের দক্ষতা ও কর্ম-উপযোগিতা (employability) বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি

শিল্পের বিকাশে ঋণের প্রাপ্যতা সহজীকরণ করার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেড়েছে। সর্বোপরি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি যৌক্তিকভাবে সম্প্রসারণ করেছে অর্থ বিভাগ। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল পৌঁছে যাচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে। আবার উপবৃত্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে রচিত হচ্ছে ভবিষ্যত মানবসম্পদের ভিত। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে

- শিক্ষা, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৮ গুণ;
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৪.৬ গুণ।

১.১৭ এখানেই থেমে নেই অর্থ বিভাগের প্রচেষ্টা। উপকারভোগীর দোরগোড়ায় সরাসরি সেবা পৌঁছে দিতে G2P (Government to Person) পদ্ধতির মাধ্যমে ভাতা বিতরণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় উপকারভোগীগণ বাড়িতে বসেই নিজ নিজ পছন্দের ব্যাংক অথবা মোবাইল হিসাবে তাদের জন্য নির্ধারিত সহায়তা বা ভাতা প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে পেয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৭ মে ২০১৮ তারিখে ৭ টি উপজেলায় মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণ কার্যক্রম পাইলট ভিত্তিতে শুরু করেন। পরবর্তীতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতার উপকারভোগীগণের মাঝে ভাতা বিতরণের মাধ্যমে এ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে চালু করেন। লক্ষ্য হল- পর্যায়ক্রমে সকল ভাতাভোগীকে এই পদ্ধতির আওতায় আনা এবং নির্বিঘ্নে ও সহজে সকল উপকারভোগীর কাছে ভাতা পৌঁছে দেয়া। উল্লেখ্য যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, উপকারভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা হ্রাসসহ বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ‘ সামাাজিক সুরক্ষার জন্য সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১.১৮ সামাজিক খাতে অর্থ বরাদ্দ এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ২০০৫ সালে ১৩.৪ শতাংশ পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা ভোগ করত যা ২০১৬ সালে ২৮.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় বাজেটে নারী ও শিশু উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে জেন্ডার বাজেট এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে শিশু বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল- ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় কম মাথাপিছু আয় নিয়েও বাংলাদেশ সামাজিক সূচকে তাদের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

- দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ছিল যথাক্রমে ৪০.০ ও ২৫.১ শতাংশ, যা ২০১৬ সালের মধ্যে যথাক্রমে ২৪.৩ ও ১২.৯ শতাংশে নেমে আসে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার আরো কমে হয়েছে যথাক্রমে ২১.৮ ও ১১.৩ শতাংশ;
- বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছর, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানে গড় আয়ুষ্কাল যথাক্রমে ৬৮.৮ ও ৬৬.৬ বছর;
- বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৫ সালের ৩৬ জনের তুলনায় ২০১৭ সালে ৩১ জনে নেমে এসেছে; একবছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার ২০০৫ সালের ৪৮ জন হতে ২০১৭ সালে ২৪ জনে নেমে এসেছে।

- মাতৃ-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৫ সালের ৩.৪৮ জন হতে ২০১৭ সালে ১.৭২ জনে নেমে এসেছে।
- ২০১৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু-মৃত্যুর হার ছিল যথাক্রমে ৭৮.৮ ও ৪৩ জন। একইভাবে, এক বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে শিশু-মৃত্যু হার ছিল ভারতে ৩৪.৬ এবং পাকিস্তানে ৬৪.২ জন।

সারণি ১.২: বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান

সামাজিক সূচক	২০১৭		
	ভারত	পাকিস্তান	বাংলাদেশ
গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	৬৮.৮	৬৬.৬	৭২.৮
শিশুমৃত্যু হার (এক বছরের কম বয়সি)	৩৪.৬	৬৪.২	২৪
শিশু মৃত্যু হার (পাঁচ বছরের কম বয়সি)	৭৮.৮	৪৩	৩১
স্বাক্ষরতার হার	৬৯.৯	৫৭.০	৭২.৮

১.১৯ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে জিডিপি'র অনুপাতে বরাদ্দ ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় কম। কম বরাদ্দ নিয়েও মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৮ অনুসারে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৭২.৮ শতাংশ; ভারত ও পাকিস্তানে এ হার যথাক্রমে ৬৯.৯ ও ৫৭.০ শতাংশ।

কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা

১.২০ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষিখাতের ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে অর্থ বিভাগ এ খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি, কৃষি উপকরণ ও সেচ সুবিধা কৃষকদের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনা/ ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের পাশাপাশি অর্থকরী ফসল পাট এর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গবেষণা ও উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

- কৃষিখাতে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৫৯৫ কোটি টাকা হতে ১০.১ গুণ বাড়িয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- নিয়মিত প্রণোদনার বাইরে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
- আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য বর্তমানে হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ হারে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ হারে প্রণোদনা/ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে;
- পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির বিপরীতে প্রদত্ত ভর্তুকি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৭৫ কোটি টাকা হতে প্রায় ৭ গুণ বাড়িয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫০০ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে।

১.২১ কৃষিবান্ধব সম্পদ সঞ্চালন কার্যক্রমের প্রভাবে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও -

- বিগত দশ বছরে কৃষিখাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৮ শতাংশ হারে। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.২ শতাংশ;

– খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ২৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪০৭ লক্ষ[৪] মেট্রিক টনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২২ খাদ্যশস্য উৎপাদন ছাড়াও আপদকালীন সময়ের জন্য খাদ্যমজুদ, খাদ্য আমদানি এবং দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য-বান্ধব কর্মসূচি, টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ, ভিজিডি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ সঞ্চালনের মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

– খাদ্য খাতে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৪৯৬.৩ কোটি টাকা হতে ৬ গুণ বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হয়েছে ২,৭২৯ কোটি টাকা।

কর্মসৃজন ও দক্ষতা উন্নয়ন

১.২৩ আনুষ্ঠানিক খাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন শ্রেণির পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ, স্থানান্তর ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় অর্থ বিভাগ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি, ঋণ সুবিধা ও নীতি প্রণোদনা প্রদান এবং সহায়ক অবকাঠামো সৃজনের ফলে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে বিগত দশ বছরে। আনুষ্ঠানিক খাতের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক খাতে ব্যাপক কর্মসৃজন হয়েছে। পাশাপাশি, ব্যক্তি উদ্যোগের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য অব্যাহত ছিল। ১০০ দিনের কর্মসৃজন, চর জীবিকায়নসহ বিভিন্ন লক্ষ্য-নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রামীণ জনপদ, বিশেষ করে মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলে মৌসুমী বেকারত্ব দূর করেছে।

১.২৪ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০০৫-০৬ হতে ২০১৭-১৮ সময়ে

– দেশে মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; তন্মধ্যে, নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে ৭৩ লক্ষ;
– অনানুষ্ঠানিক খাতে মোট ১ কোটি ৪৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে;
– সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৭৭ টি পদ সৃজন করা হয়েছে;
– জুলাই, ২০০৬ হতে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে মোট ৭৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৩৬ জনের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে।

১.২৫ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অর্থ বিভাগের সম্পৃক্ততায় প্রণয়ন করা হয় 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১'; সরকারের ২৩ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট 'National Skill Development Council (NSDC) এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন অর্থের যোগান নিশ্চিত করার জন্য 'National Human Resource Development Fund (NHRDF) গঠন করা হয়েছে।

---

[৪] লক্ষ্যমাত্রা

১.২৬ দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি বড় সীমাবদ্ধতা হল শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা। ফলে একদিকে উচ্চশিক্ষিত হয়েও দেশের যুবসমাজ উপযুক্ত চাকুরির সন্ধান পায়না, অন্যদিকে দেশীয় শিল্পসমূহকে মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী বিভিন্ন কাজে বিদেশি কর্মীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। একই ভাবে, দক্ষতার ঘাটতির কারণে বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকেরা যথাযথ মজুরি পায়না। এ সীমাবদ্ধতা দূর করতে অর্থ বিভাগ শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে দক্ষতা উন্নয়নের বিশেষ কার্যক্রম শুরু করে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে। তিনধাপে মোট ১৫ লক্ষ লোকের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১০ বছর মেয়াদি 'Skill for Employmentt Investment Program (SEIP)' বাস্তবায়ন করছে অর্থ বিভাগ। শ্রমবাজার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ১২টি সেক্টরভিত্তিক শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত

- ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৪৭ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে মোট ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২৬ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে;
- পরিবহন খাতে এক লক্ষ দক্ষ ও পেশাদার গাড়িচালক তৈরির বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

কর্মচারী কল্যাণ

বেতন বৃদ্ধি, পেনশন সহজীকরণ ও অন্যান্য

১.২৭ সরকারি চাকুরিজীবীদের সার্বিক জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত দশ বছরে সরকার জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ ও জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এ প্রথমবারের মত সরকারি চাকুরিজীবীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতার প্রবর্তন করা হয়। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন সময়ে ২০ শতাংশ হারে মহার্ঘ্য ভাতাও প্রদান করা হয়। বিশেষ করে, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণে বেশ কিছু সংস্কার আনা হয়। উল্লেখযোগ্য সংযোজনের মধ্যে আছে:

- সকল বেতন গ্রেডে মূল বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা এবং মূল বেতনের ৩.৭৫% হতে ৫% হারে ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান
- সকল কর্মচারীর জন্য আহরিত মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা চালুকরণ;
- স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ছুটিসহ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা চালুকরণ;
- কর্মচারীদের অবসরকালে অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ (বার) মাসের ছুটি নগদায়নের স্থলে ১৮ (আঠার) মাসের ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রদান এবং আনুতোষিকের হার প্রতি ০১ (এক) টাকার বিপরীতে ২০০/- টাকার স্থলে ২৩০/- টাকায় উন্নীতকরণ;
- শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী সন্তানকে আজীবন এবং বিপত্নীক স্বামীকে সর্বাধিক ১৫ বছর পারিবারিক পেনশন সুবিধা এবং মাসিক চিকিৎসা ভাতা ও বছরে দু'টি উৎসব ভাতার সুবিধা প্রদান;

- পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল ১০-২৫ বছর এর স্থলে ৫-২৫ বছর নির্ধারণ এবং পেনশনের হার সর্বশেষ আহরিত বেতনের ৮০ শতাংশের পরিবর্তে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ;
- সরকারি পেনশন এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য মাসিক পেনশনের ৫ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট চালুকরণ;
- সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পারিবারিক পেনশন ৩০ শতাংশ হতে বাড়িয়ে বেসামরিক কর্মচারীদের ন্যায় শতভাগে উন্নীতকরণ;
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার

১.২৮ সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা আনয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা গ্রহীতার নিকট নির্বিঘ্নে সকল ধরনের আর্থিক সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগ, জনবল ও অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ বেশ কিছু পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে ও অব্যাহত রেখেছে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য সংস্কারের মধ্যে আছে-

- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ প্রণয়ন;
- Financial Reporting Act ২০১৫ প্রণয়ন;
- অন-লাইনে সরকারি কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ ও বেতন বিল দাখিল এবং ইলেকট্রনিক-ফান্ড-ট্রান্সফার (ইএফটি) পদ্ধতিতে বেতন প্রদান; বেতন বিল ছাড়াও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল ও ঋণ অগ্রিমের হিসাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হচ্ছে, যে তথ্য কর্মচারীরা অনলাইনে যে কোন সময়ে দেখতে পাচ্ছেন;
- পেনশনারদের ডাটাবেইজ তৈরি এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান;
- সরকারি খাতে অর্থ জমাদানের জন্য অন-লাইন ই-চালান পদ্ধতি প্রবর্তন; এর মাধ্যমে ঘরে বসেই সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা দেয়া এবং তা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) নামক ইন্টারনেটভিত্তিক, কেন্দ্রীভূত ও অত্যাধুনিক সিস্টেম চালুকরণ; এ সিস্টেম ব্যবহার করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহ তাদের বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ বিভাজন, অর্থ অবমুক্তকরণ ও পুনঃউপযোজনের কাজ শুরু করেছে। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক ও সিজিডিএফ-এর অধিক্ষেত্রের সকল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে সিস্টেমটি চালু হয়েছে এবং সকল লেনদেন বিস্তারিতভাবে এই সিস্টেমে সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে, বিল পাশের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। সারাদেশে সরকারের সকল লেনদেন বিস্তারিতভাবে আইবাস++ এ সংরক্ষিত হওয়ায় সরকারের লেনদেন এবং নগদ অবস্থার (cash position) তাৎক্ষণিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে;

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Government Financial Management Information System (GFMIS) এর আলোকে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি (Budget and Accounts Classification System - BACS) প্রবর্তনসহ iBAS++ এর সাথে একীভূতকরণের মাধ্যমে নতুন শ্রেণিবিন্যাস কোড চালুকরণ এবং এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন; এই শ্রেণিবিন্যাস কোড চালুর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানসহ সরকারের সর্বপ্রকার আয় ও ব্যয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া যাচ্ছে;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ এবং জি-টু-পি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের পছন্দমত ব্যংক একাউন্ট অথবা মোবাইল হিসাবে ইএফটির মাধ্যমে সরাসরি ভাতা প্রদান;
- আউটসোর্সিং (Outsourcing) সংক্রান্ত নীতিমালা ২০০৮ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগ

১.২৯ সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতের বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃজনের পাশাপাশি বৃহৎ প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। পিপিপি প্রক্রিয়ার সাথে শুরু থেকেই অর্থ বিভাগ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থ বিভাগে পিপিপি-কেন্দ্রিক যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় তার মধ্যে আছে-

- Bangladesh Public-Private Partnership (PPP) Act, ২০১৫ প্রনয়ন;
- অর্থ বিভাগে পিপিপি ইউনিট স্থাপন, PPPTAF (PPP Technical Assistance Fund) নামক ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন;
- অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কিন্তু আর্থিকভাবে অলাভজনক পিপিপি প্রকল্পকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রকল্পে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে শতকরা ৩০ ভাগ Viability Gap Financing (VGP) এর সংস্থান রাখা;
- পিপিপি উদ্যোগে গৃহীতব্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১,৬০০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধনবিশিষ্ট নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited গঠন (বর্তমান পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২,০৫৯ কোটি টাকা)।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন

১.৩০ ইতোমধ্যে সমাপ্ত এমডিজি (২০০১-২০১৫) এবং চলমান এসডিজি (২০১৬-২০৩০) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ১০ বছর মেয়াদকালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। এমডিজির শেষ বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জন করেছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে-

- লক্ষ্য অপেক্ষা দ্রুততর সময়ে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমোচন অনুপাত হ্রাস; ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ২৯.০ শতাংশ থাকলেও অর্জন ছিল ২৪.৮ শতাংশ;

- কম ওজনের শিশুর সংখ্যা হ্রাস এবং ৫ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার হ্রাস; যেমন ৫ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যুহার হার হ্রাস করে ৪৮ এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যের বিপরীতে তা ৩৬ এ নেমে আসে;
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার দাঁড়িয়েছে ৯৮ শতাংশ এবং ছেলে ও মেয়ে শিশুর অনুপাত ১.০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে;
- এন্টিরেট্রোভাইরাল ড্রাগের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ;
- পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের কীটনাশক প্রতিরোধক মশারি ব্যবহার বৃদ্ধি;
- টিবি থেকে নিরাময়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

১.৩১ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের বিপরীতে বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখা এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় বরাদ্দকৃত অর্থের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমডিজি বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১.৩২ এমডিজি বাস্তবায়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে ২০১৬ সাল থেকে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এসডিজি'র প্রায় ৮২ শতাংশকে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে গ্রহণ করায় দু'টি কার্যক্রমে সম্পদ সঞ্চালন ও এদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। ইতোমধ্যে লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং তথ্য-উপাত্ত প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত কর্ম পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো চুড়ান্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রতিবেদন অনুসারে অধিকাংশ অভীষ্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক। লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ প্রদানের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও স্ব স্ব মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে এসডিজি'র যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জলবায়ু অর্থায়ন

১.৩৩ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নাজুক। এ বাস্তবতায়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও তার সাথে খাপ খাওয়ানোর কার্যক্রমকে সরকারের বাজেট কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১৪ সনেই জলবায়ু রাজস্ব কাঠামো (Climate Fiscal Fund) (সিএফএফ) অনুমোদন করে। এ কাঠামোর উদ্দেশ্য হল সরকারি অর্থায়ন ব্যবস্থাকে প্রস্তুত রাখা, যাতে জলবায়ু খাতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রাপ্ত তহবিলের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। Inclusive Budgeting and Planning for Climate Resilience শীর্ষক একটি জলবায়ু অর্থায়ন সংস্কার প্রকল্পের আওতায় অর্থ বিভাগ ২০১৬ সন হতে উক্ত কাঠামো (সিএফএফ) ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বর্তমানে বাজেট প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত হয়েছে।

১.৩৪ ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কার্যপরিকল্পনা’ এবং সরকারি ব্যয় সংশ্লেষ সম্পর্কে নীতি নির্ধারকগণসহ বিভিন্ন স্তরের অংশীজনকে সম্যক অবহিত রাখার লক্ষ্যে ছয়টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তুলে ধরে অর্থ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ‘জলবায়ু সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন: বাজেট প্রতিবেদন’ প্রণয়ন করে। এর ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরে ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯’ প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রমের তথ্য ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, সামগ্রিক সরকারি ব্যয়ে জলবায়ু খাতের হিস্যা ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে সরকারি বিনিয়োগের ফলাফল মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে জলবায়ু খাতের ব্যয়কে সরকারি নীরিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থ বিভাগ ইতোমধ্যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

২.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও ন্যায়ভিত্তিক কর নীতি অনুসরণ এবং কার্যকর কর প্রশাসনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ করে থাকে। জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত ও টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব যোগান দেয়াই এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। এই বিভাগের অধীনস্ত দুটি বৃহৎ সংস্থা হলো- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর। এছাড়া ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল এবং কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনাল অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছেঃ

- এনবিআর এর আওতাধীন করসমূহ;
- এনবিআর এর আওতা বর্হিভূত করসমূহ; এবং
- কর বহির্ভূত রাজস্ব।

২.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য করসমূহের মধ্যে রয়েছে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি। শুল্ক ও কর আদায় করা ছাড়াও শুল্ক-কর আরোপ, আরোপিত বা বিদ্যমান শুল্ক-করের হার পরিবর্তন তথা হ্রাসবৃদ্ধি, যৌক্তিকীকরণ ও উদারীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্পন্ন করে থাকে। অন্যদিকে, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে আহরিত সম্পদ সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারমূলক কার্যক্রম

আইন ও বিধি সংস্কার

২.২ দেশের দ্রুত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রেক্ষিত ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনায় রেখে ২০০৯ হতে ২০১৮ সময়কালে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুশাসনাধীন আইন ও বিধিসমূহ ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়, যে প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১২ ও এর আলোকে নতুন মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা প্রণয়ন

২.৩ মূল্য সংযোজন আইন প্রথম প্রবর্তন করা হয় ১৯৯১ সনে। আইনটি প্রবর্তনের পর হতে গত ২৭ বছরে মূল আইন ও এর বিধিবিধানসমূহ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন/সংশোধিত হওয়ায় আইনটিকে সহজবোধ্য করা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিবিধানসমূহ সহজীকরণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। সুতরাং, বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে সরকার

'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন ২০১২', এবং 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬' প্রণয়ন করেছে। নতুন এই আইন আন্তর্জাতিক আদর্শিক বা তাত্ত্বিক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ও দেশীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ করে তৈরি করা হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর পরিবর্তে নতুন আয়কর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ

২.৪ অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের মডেল পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে আয়কর ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশটি ১৯৮৪ সনে প্রণীত। কাজেই বিদ্যমান আয়কর আইনকে যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাসমূহ কর ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আয়কর আইনের কাঠামোগত সংস্কার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সে কারনে এ আইনের বর্তমান ইংরেজি সংস্করণের পরিবর্তে সহজবোধ্য বাংলায় একটি যুগোপযোগী নতুন আয়কর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা ক্রমবর্ধনশীল জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে করদাতাবান্ধব পরিবেশ সৃজন, আয়কর ধার্যকরণ ও আদায় এবং অধিক পরিমাণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ নিশ্চিত করবে। নতুন আয়কর আইনের প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সঙ্গে আলোচনা চলছে। ২০১৯ সনের জুলাই মাসে এটি আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

The Customs Act 1969 পরিবর্তে নতুন কাস্টমস আইন প্রণয়নের উদ্যোগ

২.৫ ক্রমবর্ধনশীল আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাস্টমস্ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা চলমান আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ (Harmonization) ও সহজীকরণের (Simplification) মাধ্যমে একটি নতুন কাস্টমস্ আইন ২০১৮ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। কাষ্টমস্ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার সময় ও ব্যয় (Time and Cost) হ্রাস করে বাণিজ্যকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক ও ভোক্তা স্বার্থবান্ধব করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কাস্টমস্ ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাসমূহ উক্ত খসড়ায় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বর্তমান ইংরেজি Customs Act এর পরিবর্তে সহজবোধ্য বাংলায় প্রণীত এই নতুন কাস্টমস আইন এর খসড়াটির জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে আইনটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পাশের জন্য এটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে।

জনবলের পুনর্বিন্যাসঃ

২.৬ অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় আশি ভাগ ও কর রাজস্বের প্রায় পঁচানব্বই ভাগ সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সংগঠন, জনবল, লজিষ্টিকস্, আধুনিক প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার ও সক্ষমতার (Capacity) দিক থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ছিল। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী দুই দশকের অধিক সময় বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ২০০৯ সনে ক্ষমতায়

এসেই বর্তমান সরকার এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় এবং রাজস্ব প্রশাসনের ব্যাপক সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০১১ সনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর এবং কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগে বড় ধরণের সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আয়কর অনুবিভাগের আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ৪টি নতুন সদস্য পদ, ১৫টি নতুন কর অঞ্চল, ৩৪৬টি নতুন কর সার্কেল সৃষ্টিসহ ৩,৬০৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কাস্টমস অনুবিভাগ ও মূসক অনুবিভাগের আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ৪টি নতুন সদস্য, ১৪৬টি নতুন সার্কেল, ৫৬টি বিভাগীয় অফিস, ৬টি কমিশনারেট, ২টি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ গঠন, ২টি কাস্টম হাউস, ১টি বন্ড কমিশনারেট সৃষ্টিসহ ৫,২৪১টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। একই সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং তার অধঃস্তন দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে বিগত বছরগুলোতে আয়কর এবং কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগে একদিকে যেমন প্রশাসনিক কাঠামোর আধুনিকায়ন হয়েছে এবং অন্যদিকে তেমনি বর্ধিত জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব প্রশাসনের সম্প্রসারিত কাঠামো ও বর্ধিত জনবল সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

শুল্ক ও কর কাঠামোর সংস্কার (প্রযুক্তিগত কৌশলের পরিবর্তন)

২.৭ বিনিয়োগ ও ব্যবসা প্রসারের জন্য সুষম শুল্ক ও কর কাঠামো গঠনের অপরিহার্যতা বিবেচনায় বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শুল্ক ও কর কাঠামোর সংস্কারের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। গত দশ বছরে এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট বেগবান হয়েছে এবং করদাতা সেবা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত দশ বছরে সরকার কর্তৃক গৃহীত মূসক, কাস্টমস এবং আয়কর অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত সংস্কার নিম্নে তুলে ধরা হলো:

মূসক বিভাগের সংস্কার

২.৮ আমাদের দেশে মূসক ব্যবস্থাপনার প্রায় সকল কার্যক্রম এতদিন ম্যানুয়ালি সম্পাদন করা হতো। এই দশ বছরে মূসক প্রশাসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারসহ বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে –

- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় ঘরে বসেই অনলাইনে মূসক (ভ্যাট) রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, করদাতাগণ যেন অনলাইনে মূসক রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধ করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে;
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডিজিটালাইজড কর-প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের cost of doing business উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে এবং কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- দেশে ভৌত অবকাঠামো খাতের জন্য এই সরকারের বিপুল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কতিপয় খাতকে (যথা: রূপপুর পারমানবিক প্রকল্প, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, পিপিপি ইত্যাদি) ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

- মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে e-learning ও VAT Help Line চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ভ্যাট বিষয়ক যে কোন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানের জন্য ১৬৫৫৫ নম্বরে কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- কর প্রদানে সকলকে উৎসাহিত করতে বৈশাখ মাসে হালখাতা পালন করা হচ্ছে;
- করদাতাদের সচেতন করা ও রাজস্ববান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় করদাতাদের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ভ্যাট দিবস ও জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে;
- মোবাইলের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১ শতাংশ উন্নয়ন সারচার্জ আরোপের লক্ষ্যে উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে;
- পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১ শতাংশ পরিবেশ উন্নয়ন সারচার্জ, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য ১ শতাংশ তথ্য প্রযুক্তি সারচার্জ এবং তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উপর ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে।

কাস্টমস বিভাগের সংস্কার

২.৯ গত দশ বছরে কাস্টমস বিভাগেও অনেক সংস্কারমূলক কাজ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: আমদানি-রপ্তানি পণ্যের কাস্টমস এ্যাসেসমেন্ট ও ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সহজীকরণ ও স্বল্পতম সময় এবং খুব কম খরচে হয়রানিমুক্ত ভাবে তা সম্পন্ন করার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অটোমেশন সিস্টেম তথা ASYCUDA World ব্যবস্থা প্রবর্তন। উল্লেখ্য, ২০১৩ সনে উক্ত ব্যবস্থা চালুর পূর্বে যে ASYCUDA++ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ওয়েবভিত্তিক ছিল না। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণপূর্বক আরো বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে –

- বিভিন্ন মহলের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং কার্যকারিতার যথার্থতা প্রমাণিত না হওয়ায় দীর্ঘ বার বছর পর বাধ্যতামূলক পিএসআই পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে;
- দেশের সকল কাস্টম হাউস এবং প্রধান প্রধান স্থল কাস্টমস স্টেশনে ইতোমধ্যে ASYCUDA World ব্যবস্থা রোলআউট করা হয়েছে। এ কার্যক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে পেপারলেস কাস্টমস ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হবে মর্মে আশা করা যায়;
- ASYCUDA World System এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, নৌ-বাহিনী এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং ও মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়েছে;
- কাস্টম হাউসসমূহে ট্রাক ও কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে মিথ্যা ঘোষণা হ্রাস পাবে এবং আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও খালাস কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে;

- পণ্যের Supply chain security ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব কাস্টমস অর্গানাইজেশন এর সেফ (SAFE) ফ্রেমওয়ার্ক অব স্ট্যান্ডার্ডস এর অংশ হিসেবে কমপ্লায়েন্ট অপারেটরদের জন্য অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (Authorized economic operator) ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি AEO টীম গঠন করা হয়েছে এবং AEO Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। পাইলট পর্ব সম্পন্ন করে শীঘ্রই এটি কার্যকরভাবে চালু করা হবে;

- একই স্থান হতে আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালানের ছাড় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম (কাস্টমস প্রক্রিয়াসমূহ, অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি দপ্তরের ক্লিয়ারেন্স, শুল্ক-কর জমা প্রদান ইত্যাদি) সম্পন্ন করার চিন্তা থেকেই National Singe Window (NSW) ধারণার উৎপত্তি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও NSW বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ক প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে;

- শিল্পখাতের প্লান্ট, মেশিনারি বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়েছে;

- বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে হাইটেক পার্ক এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্পসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে;

- কম্পিউটার, সেলুলার ফোন ও মোটর সাইকেল এর স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি করে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

- অনাদায়যোগ্য সরকারি পাওনা অবলোপনের (Write off) লক্ষ্যে সরকারি পাওনা অবলোপন বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মানসম্মত হোটেল নির্মাণে প্রণোদনা প্রদানপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

আয়কর বিভাগের সংস্কার

২.১০ কর পরিপালন নিশ্চিত করা, কর সেবার সম্প্রসারণ ও কর ফাঁকি রোধ করে দেশে একটি আদর্শ কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিগত, প্রশাসনিক ও কর্ম-পদ্ধতি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে –

- প্রথমবারের মতো সুনির্দিষ্ট সাতটি নীতি-নির্ধারণী ভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে আয়করের আইনী সংস্কার করা হচ্ছে। ভিত্তিগুলো হচ্ছে: রাজস্ব যোগান, সমতা ও ন্যায্যতা বিধান, প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা, সামাজিক দায়িত্ব পালন, কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ, কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার প্রবর্তন এবং কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি।;

- রিটার্ন দাখিলের জন্য অপরিবর্তনীয় কর দিবস বা 'Tax Day' এর প্রবর্তন করা হয়েছে;

- করঘাত (tax burden) এ সমতা আনয়নের লক্ষ্যে আয়করের প্রগ্রেসিভিটি নীতির আওতায় কর রেয়াতের হার ও সারচার্জের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;

- কর নীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করে তৈরি পোশাক খাতের সবুজ কারখানার করহার ১০ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে;
- ব্যক্তি করদাতাদের কর প্রদান পদ্ধতি সহজতর করার লক্ষ্যে রিটার্ণ ফরম সহজীকরণ করা হয়েছে;
- করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিভাগীয় শহরসহ দেশের প্রতিটি জেলায় আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির লালন-পালনে অতিরিক্ত ব্যয়ভারের প্রয়োজন হয় বিধায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতার জন্য করমুক্ত সীমা উন্নীতকরণ করা হয়েছে;
- Elderly care home পরিচালনা হতে অর্জিত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রয়াস

২.১১ দেশের প্রধান অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে কাস্টমস, আবগারি ও মুসক এবং আয়কর বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যবহার কার্যক্রম একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় নিশ্চিত করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন সকল দপ্তরে শুল্ক ও কর নিরুপন, আহরণ, যাচাই ও মনিটরিং এবং তথ্য সংরক্ষণের কাজে কম্পিউটারাইজেশনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে কাস্টমস, মূসক এবং আয়কর এই তিন অনুবিভাগই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সার্বিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম

২.১২ আইন ও জনবল সংক্রান্ত সংস্কার কার্যক্রম ছাড়াও একটি আধুনিক রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯-২০১৮ সময়কালে সরকার চলমান আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আধুনিকায়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০১৬

২.১৩ এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল, যাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়নের কৌশলগত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃকও এটি অনুমোদিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন শুল্ক ও কর ব্যবস্থা আধুনিকায়নে এটি মূল দলিল। এনবিআর এর অন্যান্য সকল সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম এই দলিলের আওতায় নেয়া হচ্ছে। উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা দলিলের আওতায় ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সক্ষমতা ও করদাতা সেবা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- বিদ্যমান করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) যথাযথকরণ (Cleansing) ও জাতীয় সনাক্তকরণ নম্বর (NID) এর ভিত্তিতে নতুন TIN ও মূসক নিবন্ধন (BIN) প্রদান কার্যক্রম চলছে। এটা সম্পন্ন হলে রাজস্ব প্রশাসনে বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায়;

- কাস্টমস্, মূসক ও আয়কর বিভাগে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Alternative Dispute Resolution) প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে করদাতাদের সাথে কর বিভাগের দূরত্ব কমে যাবে;
- অনলাইনে করদাতা নিবন্ধন, আয়কর রিটার্ণ দাখিল ও কর পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে;
- করদাতা সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে একাধিক কর সেবা কেন্দ্র (Taxpayer Service Center) স্থাপন করা হয়েছে;
- কর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর বিভিন্নভাবে প্রচার ও করদাতা প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে;
- আন্তঃসীমানা (cross-border) কর ফাঁকি রোধকল্পে ট্রান্সফার প্রাইসিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে;
- তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারকারী করদাতার কর ফাঁকি মোকাবেলায় ডেটা ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়

২.১৪ ২০০৯ হতে ২০১৮ সন পর্যন্ত বর্তমান সরকারের সময়কালে বাংলাদেশে এনবিআর রাজস্ব আদায় রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এ সময়কালের রাজস্ব আদায় প্রবৃদ্ধি এবং কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত স্বাধীনতা উত্তরকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। এ সময়কালে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আদায়ের হারও ছিল বেশি, যা দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঙ্গিত বহন করে। নিম্নের ছকে (সারণি ২.১) ২০০২-০৩ থেকে ২০১৭-১৮ সময়ের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি তুলে ধরা হলো।

সারণি ২.১: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থছর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়	জি.ডি.পি (বাজার মূল্য)	এনবিআর রাজস্ব ও জি.ডি.পি অনুপাত
১	২	৩	৪
২০০২-০৩	২৩৬.৫	৩,০০৫.৮	৭.৮৭
২০০৩-০৪	২৬১.৯	৩,৩২৯.৭	৭.৮৭
২০০৪-০৫	২৯৯.০১	৩,৭০৭.১	৮.০৭
২০০৫-০৬	৩৪০.০	৪,১৫৭.৩	৮.১৭
২০০৬-০৭	৩৭২.২	৪,৭২৪.৮	৭.৮৮
২০০৭-০৮	৪৭৪.৪	৫,৪৫৮.২	৮.৬৯
২০০৮-০৯	৫২৫.৩	৬,১৪৮.০	৮.৫৪
২০০৯-১০	৬২০.৪	৬,৯৪৩.২	৮.৯৬
২০১০-১১	৭৯৪.০	৭,৯৬৭.০	৯.৯৭
২০১১-১২	৯৫০.৬	৯,১৮১.৮	১০.৩৯
২০১২-১৩	১০৯২.২	১০,৩৭৯.৯	১০.৫২
২০১৩-১৪	১২০৮.২০	১৩৪৩৬.৭৪	৮.৯৯%

অর্থছর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়	জি.ডি.পি (বাজার মূল্য)	এনবিআর রাজস্ব ও জি.ডি.পি অনুপাত
২০১৪-১৫	১৩৫৭.০১	১৫১৫৮.০২	৮.৯৫%
২০১৫-১৬	১৫৩৬.২৭	১৭২৯৫.৬৭	৮.৮৮%
২০১৬-১৭	১৭১৬.৫৬	১৯৭৫৮.১৫	৮.৬৯%
২০১৭-১৮	২০৬৪.০৭	২২৫০৪.৭৯	৯.১৭%

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২.১৫ ২০02-০৩ অর্থ বছরে আদায়কৃত এনবিআর রাজস্ব ছিল ২৩,৬৫১ কোটি টাকা, যা ২০০৬-০৭ সালে ৩৭,২১৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে বিবেচ্য সময়ে রাজস্বের প্রবৃদ্ধি ছিল বছরে গড়ে ১১.৫ শতাংশ মাত্র। অন্যদিকে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ সময়ে রাজস্ব ৫২,৫২৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২,০৬,৪০৭.২৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। গত দশ বছরে এনবিআর রাজস্বের পরিমাণ প্রায় চারগুণ হয়েছে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল ২০.২৪ শতাংশ, যা পূর্বতন সরকারের সময়কার অর্জিত প্রবৃদ্ধির প্রায় দ্বিগুণ। এনবিআর রাজস্বের এই বিস্ময়কর (phenomenal) প্রবৃদ্ধি সরকারের সুষ্ঠু ও সঠিক করনীতি ও ব্যবস্থাপনার ফসল।

২.১৬ অন্যদিকে, ২০০২-০৩ পরবর্তী জিডিপি-এনবিআর রাজস্ব অনুপাত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০২-০৩ থেকে ২০০৬-০৭ সময়ের এই অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত (৭.৮৭ শতাংশ থেকে ৭.৮৮ শতাংশ) ছিল। বর্তমান সরকার যখন দায়িত্ব নেয় (২০০৮-০৯) তখন জিডিপি-এনবিআর কর অনুপাত ছিল ৮.৫ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তা বেড়ে ৯.১৭ শতাংশ হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সরকারের দশ বছরে কর-জিডিপি অনুপাত বেড়েছে।

সার্বিক রাজস্ব আদায়

২.১৭ অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের প্রধান প্রধান খাতসমূহ হচ্ছেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তক আদায়কৃত করসমূহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতা বর্হিভূত করসমূহ এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল জিডিপির ১০.১২ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ১২.৪১ শতাংশ। অর্থাৎ মোট রাজস্ব আদায় বর্ণিত সময়ে জিডিপির ২.৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০২-০৩ হতে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সার্বিক রাজস্ব আদায় জিডিপির ১০ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই হার জিডিপির ১০.২ শতাংশ ছিল। ২০০২-০৩ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদায়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতা বর্হিভূত এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-৭ এ উপস্থাপন ধরা হয়েছে।

কর আরোপ ও আদায় পরিবেশ

২.১৮ কর আরোপ ও আদায় পরিবেশের পরিবর্তনে বিগত সময়ে অনেক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ প্রতিবছর ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন, সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সনাক্তকরণপূর্বক

স্বীকৃতি প্রদান, বিভাগীয় শহরে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন, কর কর্মকর্তাদের প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, ইত্যাদি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীন কাস্টমস্, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিভাগ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও করদাতাদের উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করছে। এসব সেবার কারণে করদাতাদের মধ্যে কর প্রদানের সংস্কৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে যা অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সংস্কারমূলক কার্যক্রম

২.১৯ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্র বিক্রয়লব্ধ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থার উপর চাপ প্রশমনে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ঘাটতি অর্থায়নের মূল্যস্ফীতি প্রভাবও (Inflationary Impact) কম নয়। এছাড়া, জাতীয় সঞ্চয় স্কীমে বিনিয়োগের মাধ্যমে মহিলা ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করেন।

সারণি ২.২: বিদ্যমান জাতীয় সঞ্চয় স্কিম

সঞ্চয় স্কিমের নাম	মুনাফার হার	উৎসে কর	মন্তব্য
৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র*	১১.২৮%	৫%	১. নতুন মুনাফার হার ২৩ মে ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। ২. উক্ত তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয় স্কিমসমূহের ক্ষেত্রে ক্রয়কালীন সময়ের বিদ্যমান হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে। ৩. প্রযোজ্য হারে উৎসে আয়কর কর্তন হবে। ৪. কর কমিশন কর্তৃক ভবিষ্য তহবিল ও কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে না। * স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা বিদ্যমান
৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১১.০৪%	৫%	
পরিবার সঞ্চয়পত্র	১১.৫২%	৫%	
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১১.৭৬%	৫%	
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড*	১২.০০%	করমুক্ত।	
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	৭.৫০%	১০%	
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদি হিসাব*	১১.২৮%	১০%	
ডাক জীবন বীমা (আজীবন/মেয়াদি)	৪.২/৩.৩	করমুক্ত।	
বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	৬.৫০%	২০%	
ইউ.এস.ডলার প্রিমিয়াম বন্ড*	৭.৫০%	করমুক্ত।	
ইউ.এস.ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড*	৬.৫০%	করমুক্ত।	

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে সংস্কারমূলক কার্যক্রম

২.২০ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর নিম্নরুপ সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

- মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে গত ২০০৯-১০ অর্থবছরের শুরুতে আকর্ষণীয় মুনাফাহারে পরিবার সঞ্চয়পত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে, যেখানে মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

- বয়োজ্যেষ্ঠ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী বাংলাদেশি (পুরুষ/মহিলা) নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে অধিক মুনাফা সম্বলিত পরিবার সঞ্চয়পত্রে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ হতে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

- গত ১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্রয়কৃত অধিকাংশ সঞ্চয় স্কীমে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ২০১০-১১ অর্থবছর হতে জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহের মুনাফার হার ৪ (চার) বার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

- গত ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হতে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউ.এস.ডলার প্রিমিয়াম বন্ড একাধিক মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা চালু করা হয়েছে।

- অনিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কথা বিবেচেনা করে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ওয়েজআর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ. এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এর বিধিবিধান নিম্নরূপভাবে সংশোধন করে ক্রেতাবান্ধব করা হয়েছে –

  - ✓ ওয়েজআর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফার হার বৃদ্ধিপূর্বক যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।
  - ✓ ওয়েজআর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা (Death Risk Benefit) ২.৫ লক্ষ টাকা হতে বাড়িয়ে ৫.০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
  - ✓ ইউ. এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের জন্য প্রিমিয়াম বন্ডের অনুরূপ মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা (Death Risk Benefit) চালু করা হয়েছে।
  - ✓ ওয়েজআর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে ৮ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব অংকের বিনিয়োগকারীদের জন্য সি.আই.পি সুবিধা চালু করা হয়েছে।
  - ✓ বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট (FC Account) ছাড়াও বন্ড ইস্যুর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
  - ✓ বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাতে পাসপোর্টের কপি প্রদান করে এবং বিদেশি পাসপোর্টধারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ যাতে তাদের পাসপোর্টে বাংলাদেশ দূতাবাস হতে পাওয়া 'No Visa Required' সিল-সহ পাসপোর্টের কপি প্রদান করে বন্ড ক্রয় করতে পারে সে ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
  - ✓ বিদেশে অবস্থিত এক্সচেঞ্জ হাউসসমূহের মাধ্যমে বন্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
  - ✓ বন্ড হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সময়সীমা ৬ মাস হতে কমিয়ে ২ মাসে নামিয়ে আনা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা পরিবর্তন করে শুধুমাত্র স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে জিডি করে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর বিধান চালু করা হয়েছে।

✓ ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদি হিসাব একাধিক মেয়াদে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা চালু করা হয়েছে।

- ২০১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে অধিদপ্তর-এ উন্নীত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারনের নিমিত্ত সকল স্তরে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বিদ্যমান অল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা অধিক সংখ্যক গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রমে ই-সেভিংস সফ্‌টওয়ার চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সঞ্চয়পত্রের স্ক্রিপ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য একটি অত্যাধুনিক ভল্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- বিনিয়োগকারীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ একটি ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।
- বিদ্যমান জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
- বরিশাল, রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহে বিভাগীয় অফিস চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সঞ্চয় অফিসার পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে আহরিত সম্পদের বিবরণীঃ

২.২১ জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কীমের আওতায় আহরিত সম্পদের বিবরণী পরিশিষ্ট-৮ এ তুলে ধরা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের জন্য আর্থিক মধ্যস্থতা জরুরি। আর্থিক মধ্যস্থ্যতার অন্যতম অনুঘটক হল ব্যাংক, বীমা, পুঁজিবাজার ও অন্যান্য আর্থিক খাত। সার্বিকভাবে আর্থিক খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নিবিড় করার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি ২০১০ এ অর্থ বিভাগের ব্যাংকিং অনুবিভাগকে বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' নামের মধ্যে এ বিভাগের কার্যক্রমের পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলন না থাকায় ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে বিভাগটির নাম পরিবর্তন করে 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়ন এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বিভাগের মূল কাজের মধ্যে আছে- ব্যাংক, বীমা, আর্থিক ও নন-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন, এতদ্বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান, আর্থিক খাতের সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, লিঁয়াজো রক্ষা ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে মুদ্রা ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩.১ আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মূলত নিম্নবর্ণিত নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের (সারণি- ৩.১) কার্যাবলী সমন্বয় করে থাকে:

১. বাংলাদেশ ব্যাংক
২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)
৩. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বীউনিক)
৪. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)

সারণি ৩.১: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
১. ৫৮টি তফসিলভুক্ত ব্যাংক (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০৭ টি বাণিজ্যিক ও ০২টি বিশেষায়িত ব্যাংকসহ) ২. ৪টি রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ৩. ৩৪টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০২টিসহ)	১. ৩২টি লাইফ বীমা কোম্পানি (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০১টি সহ) ২. ৪৬টি নন লাইফ বীমা কোম্পানি (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০১টি সহ)	১. মোট ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান-৮৩৩টি ২. সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান-৭০৫টি ৩. সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ১২৮টি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	
১. স্টক এক্সচেঞ্জ-০২টি	৭. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট
২. মার্চেন্ট ব্যাংক-৫৭টি	৮. ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি-৮টি (১টি SME ক্রেডিট রেটিং কোম্পানিসহ)
৩. স্টক-ব্রোকার/স্টক-ডিলার-৩৯৮টি (ডিএসই + সিএসই)	৯. ট্রাস্টি-১৫টি
৪. সম্পদ ব্যবস্থাপক-২৪টি	১০. ফান্ড ম্যানেজার-৭টি
৫. কাস্টোডিয়ান-২০টি	
৬. সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লি. (সিডিবিএল)-০১টি	

সূত্র: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৩.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর মূল উদ্দেশ্য হল-

১. ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, শৃঙ্খলা উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, এবং জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;

২. পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ;

৩. বীমা খাতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ;

৪. সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সহায়তা জোরদার করা।

৩.৩ বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদের শাসনামলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে তুলে ধরা হল:

(ক) ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কার্যক্রম

মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

৩.৪ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। পাশাপাশি, দেশের আর্থিক খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, সার্বিক লেনদেন ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিচালনা, নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে আসছে। পাশাপাশি, পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পরিবেশ-বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকারভিত্তিক অর্থায়ন (green financing) নিশ্চিত করা ও বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতেও এর প্রতিফলন রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিপূরক হিসবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

৩.৫ মুদ্রানীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ সাবলীল রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। একই সাথে, মূল্যস্ফীতি প্রশমনের জন্য মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছে। এ সমন্বয়ের কাজটি বিগত বছরগুলিতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে, উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিপরীতে মূল্যস্ফীতি কমেছে এবং দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল থেকেছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৭.২ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ১২.৩ শতাংশ হতে সর্বশেষ আগষ্ট ২০১৮ সময়ে ৫.৪৮ শতাংশে (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) নেমে এসেছে।

৩.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসৃত মুদ্রানীতির উৎকর্ষতার আরও একটি নিদর্শন হল বিগত দশ বছরে ঋণ ও আমানতের সুদের হার পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নয়ন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে আমানত ও ঋণের সুদের হার প্রান্তিকভাবে বেড়ে গেলেও সার্বিকভাবে সুদের হার পরিস্থিতি ছিল আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের পক্ষে অনুকূল। সুদের হারের ব্যাপ্তি (Interest rate spread) ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৫.৩৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ৪.৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদের হারের চিত্র (ভারিত গড় (%))

তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদের হার চিত্র (ভারিত গড় %)			
অর্থবছর	আমানতের সুদের হার	ঋণের সুদের হার	সুদের হারের ব্যাপ্তি
২০০৫-০৬	৬.৬৮	১২.০৬	৫.৩৮
২০০৬-০৭	৬.৮৫	১২.৭৮	৫.৯৩
২০০৭-০৮	৬.৯৫	১২.২৯	৫.৩৪
২০০৮-০৯	৭.০১	১১.৮৭	৪.৮৬
২০০৯-১০	৬.০১	১১.৩১	৫.৩০
২০১০-১১	৭.২৭	১২.৪২	৫.১৫
২০১১-১২	৮.১৫	১৩.৭৫	৫.৬০
২০১২-১৩	৮.৫৪	১৩.৬৭	৫.১৩
২০১৩-১৪	৭.৭৯	১৩.১০	৫.৩১
২০১৪-১৫	৬.৮০	১১.৬৭	৪.৮৭
২০১৫-১৬	৫.৫৪	১০.৩৯	৪.৮৫
২০১৬-১৭	৪.৮৪	৯.৫৬	৪.৭২
২০১৭-১৮	৫.৫০	৯.৯৫	৪.৪৫

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

৩.৭ বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদের শাসনামলে রপ্তানি আয় ও প্রবাস আয়ের উচ্চ প্রবাহের প্রভাবে ধীরে ধীরে বৈদেশিক মুদ্রার সন্তোষজনক রিজার্ভ গড়ে উঠেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৯.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ৩২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি ও

প্রবাস আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে খানিকটা স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার পরিস্থিতির সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ করেছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে এবং রপ্তানি ও প্রবাস আয় প্রবাহ নির্বিঘ্ন থাকছে। একই সাথে, বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের কারণে কোনরূপ বিরূপ প্রভাব কখনও পরিলক্ষিত হয়নি।

আর্থিক খাত সংস্কার

৩.৮ ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে আইনি কাঠামোর পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্ন কার্যক্রমের মধ্যে আরও আছে:

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে Core Banking Solution প্রচলন করা;
- ফিন্যান্স কোম্পানি আইন, পুঁজিবাজার এবং ব্যাংক ও বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন

৩.৯ আর্থিক খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বাড়ানো এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্টসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিল্প কারখানায় প্রয়োজনীয় মুলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। একই সাথে এসকল প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনগত সংস্কারের উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করা সহজ হচ্ছে। উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে-

আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

১. পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ;

২. ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন;

৩. বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্লাটফর্ম নিশ্চিতকরণ;

৫. আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং নীতি ও প্রবিধি, ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান, তথ্য-প্রযুক্তি, মানব-সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি সক্ষমতা কর্মসূচি গ্রহণ।

প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা

১. প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক রীতি-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং ব্যাসেল-৩ তে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ;

২. ব্যাংকিং খাতে দক্ষতার সাথে ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রস্তুত ও নীতিমালা প্রণয়ন;

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে একটি বিশদ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ

১. উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে;

২. উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা দেয়া হবে। ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে এ লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ২৩০.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৬৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

আইনগত সংস্কার

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ আদায় সম্পর্কিত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ সর্বশেষ ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়;

২. উক্ত আইনের ৫ম পরিচ্ছেদ অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১; ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এবং ব্যাসেল কমিটির মূল নীতি ২৭ এর আলোকে একটি খসড়া গাইডলাইন (Guidelines on External Audit of Banks) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৩.১০ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী অভিবাসী বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং সার্বিকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সংশ্লিষ্টতায় যেসকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা উপস্থাপন করা হল:

১. বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশের স্থানীয় ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতিতে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি/ ক্যাশ ডিপোজিট ২৫,০০০ এর স্থলে ১০,০০০ মার্কিন ডলার এবং প্রতিষ্ঠানের এনআরটি হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি ০.৫ মিলিয়ন টাকার স্থলে ০.২ মিলিয়ন টাকায় পুনঃনির্ধারণ;

২. প্রবাসীদের প্রেরিত আয় বিনিয়োগ করার বিষয় উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের বন্ডের বিপরীতে প্রবাসীদের ঋণ প্রদানের সুযোগ প্রদান;

৩. ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন কমানোর লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বহুজাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানির সাথে বাংলাদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে Pay Cash Exclusivity Clause বা অনুরূপ শর্ত, যা বাজারে Monopoly সৃষ্টি করতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

৪. বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব মালিকানায় বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান;

  - এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের ৩৪টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

৫. বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউস কর্তৃক রেমিট্যান্স আহরণকে সহজ করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের এজেন্ট নিয়োগকে উৎসাহিত করা;

৬. ব্যাংক শাখার পাশাপাশি ২৬টি Micro Finance Institutions (MFIs) এর শাখা অফিস ও বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিসসমূহকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান;

  - এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত এলাকায় রেমিট্যান্স বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সিঙ্গার বাংলাদেশ এর বিক্রয় আউটলেটসমূহের মাধ্যমেও রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণ শুরু হয়েছে।

৭. ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় প্রাপ্ত প্রবাসী রেমিট্যান্সের অর্থ বেনিফিসিয়ারি পর্যায়ে বিতরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে কমিয়ে ৪৮ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ;

৮. বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক গৃহীতব্য গৃহঋণের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ডেট ইক্যুইটি অনুপাত ৫০:৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫:২৫ এ নির্ধারণ।

পেমেন্ট সিস্টেম-এর অগ্রগতি

৩.১১ পেমেন্ট সিস্টেম এর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে আছে-

- পেমেন্ট সিস্টেম এর কৌশলপত্র প্রণয়ন;
- অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ;
- ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;

- পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইনী কাঠামো প্রণয়ন;
- ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) সিস্টেম চালুকরণ;
- রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিতকরণ; এবং
- Real Time Gross Settlement বাস্তবায়ন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

৩.১২ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর ফলে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশ গতি সঞ্চার হয়েছে। কৃষিঋণ ও স্কুল ব্যাংকিং এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর বিস্তৃতি ঘটেছে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে ছিল ৬,৪৩৫টি, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ১০,১১৪ টিতে দাঁড়িয়েছে। Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২৯টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৮টি ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করেছে। ২৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে অনলাইনে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ সেবা প্রদান করছে। মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, এটিএম বুথ ইত্যাদির সম্প্রসারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাংকিং সেবা অনেক বেশি সহজলভ্য করে তুলেছে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বাড়ছে দ্রুত। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস-এর আওতায় জুন, ২০১৮ পর্যন্ত-

- ✓ মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৮,২৯,৭৮৩ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬১.৮৬ মিলিয়ন যার মধ্যে সক্রিয় একাউন্টের সংখ্যা ২৭.২১ মিলিয়ন;
- ✓ জুন,২০১৮ মাসে মোট ১৯,২৫,৯৪,৫০৬টি লেনদেনের মাধ্যমে ৩৩২.১৩ বিলিয়ন টাকা এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১১.১ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়;
- ✓ ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ প্রতিদিন গড়ে ১.০ বিলিয়ন টাকার লেনদেন হয় এবং
- ✓ ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে ০.০২ বিলিয়ন টাকা অভ্যন্তরীণ লেনদেন হয়।

সারণি ৩.৩: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

অর্থবছর	তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা	মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী এজেন্টের সংখ্যা	মোবাইল ব্যাংক এর গ্রাহক সংখ্যা	এজেন্ট ব্যাংকিং এর এজেন্ট সংখ্যা	এজেন্ট ব্যাংকিং এর গ্রাহক সংখ্যা	এটিএম বুথের সংখ্যা
২০১৩-১৪	৮৭৯৪	৩৪৬১৭৯	১৬৪৬২৬১০	১৮	৩১১৭	৫৭৭৮
২০১৪-১৫	৯১৩১	৫৪৭৪০৭	২৮৬২৫১৩১	১০০	৩৭০৫২	৬৪৮০
২০১৫-১৬	৯৪৫৩	৬১৭৪১৮	৩৬৩৩৩৯৩৩	৬১০	২৬১৬৯৩	৮৫১৭
২০১৬-১৭	৯৭২০	৭৫৮৫৭০	৫৩৭০২৬৯০	২৮৯১	৮৪৫৬৯৯	৯২৪৬
২০১৭-১৮	১০১১৪	৮২৯৭৮৩	৬১৮৬২৯৮২	৩৫৯৮	১৭৮৩১৫৬	৯৭৪৭

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

৩.১৩ দেশের ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- ✓ ব্যাংকগুলোর সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত করা এবং ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটর করার জন্য মার্চ ২০১৬ তে জারিকৃত Asset-Liability Management Guidelines এর আলোকে দুটি বিবরণী যথা (ক) Wholesale Borrowing এবং (খ) Commitment Limit প্রস্তুতের প্রচলন;
- ✓ লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের Exposure (ঋণ, আমানত বা অন্য যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) সম্পর্কিত পৃথক বিবরণীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতঃ তদারকি জোরদার করা;
- ✓ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তি, তারল্য পরিস্থিতি, আন্তঃব্যাংক নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি ব্যাসেল-৩ অনুসারে LCR ও NSFR এর নির্ধারিত মাত্রা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এসব আর্থিক সূচকে ব্যাংকগুলোর অবস্থান অধিকতর সুসংহত করা এবং আমানতের প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রিম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রিম-আমানত হার (ADR)/ বিনিয়োগ-আমানত হার (IDR) পুনঃনির্ধারণ;
- ✓ ব্যাংকগুলোর কমার্শিয়াল পেপার প্রস্তুত সংক্রান্ত গাইডলাইন জারির প্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত বিনিয়োগ প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত মনিটরিং।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ

৩.১৪ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হল-

আইনী কাঠামো সুদৃঢ়করণ ও নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম:

- ✓ ২০০৯ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন জারি করা হয়, যা ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয় এবং ২০১২ ও ২০১৩ সালে সন্ত্রাস বিরোধী আইনেরও সংশোধন করা হয় এবং ২০১৩ সালে উক্ত আইন দু'টির আওতায় বিধিমালা জারি;
- ✓ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব এর নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন;
- ✓ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রতি তিন বছর অন্তর জাতীয় কৌশলপত্রসমূহ প্রণয়ন।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

৩.১৫ ২০০৮ সালের মিউচ্যুয়াল ইভালুয়েশন রিপোর্টের রেটিং এর উপর ভিত্তি করে ২০১০ সালে যখন এফএটিএফ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে তখন বাংলাদেশের পাশাপাশি এ তালিকায় পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মিয়ানমার,

থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া পরবর্তীতে কালো তালিকাভুক্ত হয়। বাংলাদেশ কালো তালিকাভুক্তির ঝুঁকিতে থাকলেও বর্তমান সরকারের সময়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তা হতে রক্ষা পায়। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বের হয়ে আসে। এর ফলে, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়েছে।

কমপ্ল্যায়েন্ট দেশের মর্যাদা অর্জন:

৩.১৬ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) কর্তৃক প্রণীত মিউচ্যুয়াল ইভালুয়েশন প্রতিবেদনে এফএটিএফ এর ৪০ টি সুপারিশের বিপরীতে বাংলাদেশ ৬ টি সুপারিশে Compliant (C), ২০ টি সুপারিশে Largely Compliant (LC) এবং ১৪ টি সুপারিশে Partially Compliant (PC) রেটিং অর্জন করে এবং বাংলাদেশের কোন বিষয়েই Non Compliant (NC) রেটিং নেই। অথচ, ২০০৮ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশ এফএটিএফ এর তখনকার ৪৯টি সুপারিশের বিপরীতে ১৪ টিতে Non Compliant (NC) রেটিং, ২৯ টিতে PC, ৫ টিতে LC এবং মাত্র ১টিতে Compliant রেটিং ছিল। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রেটিং নরওয়ে, শ্রীলংকা, ভুটান, মিয়ানমার, ফিজি হতে ভালো হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক উন্নত দেশ হতেও ভালো হয়েছে, যা সন্ত্রাস, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, জঙ্গিবাদ, মানিলন্ডারিংসহ অন্যান্য অপরাধ নির্মূল করার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

সারণি ৩.৪: মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের অবস্থান

দেশের নাম	Compliant (C)	Largely Compliant (LC)	Partially Compliant (PC)	Non Compliant (NC)
বাংলাদেশ	৬	২০	১৪	০
শ্রীলংকা	৫	৭	১৬	১২
ভুটান	৭	৭	১৬	১০
ফিজি	৬	১০	১৮	৬
মিয়ানমার	৭	১০	১৭	৬
কানাডা	১১	১৮	৬	৫
নরওয়ে	৫	১৭	১৮	০
অস্ট্রেলিয়া	১২	১১	১৭	০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মানোন্নয়ন

৩.১৭ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মধ্যস্থতায় বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য Key Performance Indicator নির্ধারণ;
- মানব সম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন;

- অটোমেশন ও কোর ব্যাংকিং সলুশন বাস্তবায়ন;
- জনবল সংকট নিরসন;
- উর্ধ্বতন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন, পরিচালনা পর্ষদে অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ প্রদান।

উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ ও উদ্যোক্তা গঠন

ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারসিপ ফান্ড (ইইএফ)

৩.১৮ সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ০১ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারসিপ ফান্ড গঠন করা হয়, যা ২০০৯ সনে আইসিবি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর নীতিনির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্স মনিটরিং এর কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ইইএফ এর অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২২.২৫ বিলিয়ন টাকা। এ পর্যন্ত ১,৯২৩ টি কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পে এবং ১৪০টি আইসিটি প্রকল্পে সর্বমোট ৭৮.৫ বিলিয়ন টাকা সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তন্মেধ্যে ইইএফ সহায়তা ৩৬.৭৬ বিলিয়ন টাকা। ইইএফ সহায়তার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও আইসিটি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে এযাবত প্রায় ৫৫ হাজার লোকের স্থায়ী ও মৌসুমী কর্মসংস্থান হয়েছে। আইসিটি প্রকল্পগুলোর উৎপাদিত বিশ্বমানের সফট্ওয়্যার দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রজেক্ট

৩.১৯ পিপিপি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বিভাগের পক্ষে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৪.৪১ বিলিয়ন টাকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে-

- ✓ মোট ৫৮৯ মেগা ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১২ টি বিদ্যুৎ প্রকল্প;
- ✓ ৩টি পানি শোধন প্রকল্প, একটি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো প্রকল্প;
- ✓ একটি জেটি প্রকল্প, একটি ড্রাইডক প্রকল্প;
- ✓ দেশব্যাপী ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন সংক্রান্ত ২ টি আইটি প্রকল্প; এবং
- ✓ একটি হাসপাতাল প্রকল্প।

৩.২০ এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি আইপিএফএফ-২ শীর্ষক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নযোগ্য অবকাঠামো খাতগুলো হলো: বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ; বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়ন; শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; সড়ক-মহাসড়ক, ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ; পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প এস্টেট ও পার্ক উন্নয়ন; স্বাস্থ্য ও শিক্ষা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভৃতি। প্রকল্পে চলতি সুদ হারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে ৮-২০ বছর মেয়াদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও,

বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের পাশাপাশি উদ্ভাবনী অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা আরও ব্যাপক পরিসরে বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়।

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৩.২১ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় ৫টি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৫৮,২২৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৭৫.৯৫ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহ এসএমই খাতে একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখযোগ্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের তালিকা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হল-

সারণি ৩.৫: বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	উদ্দেশ্য	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ
মফস্বলভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করা	২,৮৩৭টি কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ১৫.১৯ বিলিয়ন টাকা
বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য	৩৩,৪৭৬ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাসের জন্য ৩৪.৯৫ বিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ১৯,০০৪ টি নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০.৪৩ বিলিয়ন টাকা
এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রোগ্রাম তহবিল	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য	৩,১৬০ জন উদ্যোক্তার জন্য ৩.১৩ বিলিয়ন টাকা
এডিবি-১ তহবিল	এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য	সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সমাপ্ত করা হয়; মোট ৩,২৬৪ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৩.৩৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়
এডিবি-২ তহবিল	এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সুবিধা সম্প্রসারণ	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ১৩,৬৪৫ জন উদ্যোক্তাকে ৭.৪৭ বিলিয়ন টাকা তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে
জাইকা তহবিল	ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহ	৮৮০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬.৮৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন
কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন	নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করা	মোট ৩৬৬ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ০.২০ বিলিয়ন টাকা
ইসলামী শরিয়াভিত্তিক পুনঃ -অর্থায়ন তহবিল তহবিল	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণের অর্থায়নে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	মোট ৬৩৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪.৭৬ বিলিয়ন টাকা

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান ও তথ্য

সারণি ৩.৬: ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ তথ্য

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ	মন্তব্য
ব্যাংকের সংখ্যা	৫৭	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিলো ৪৭টি। গত দশ বছরে ১০টি নতুন ব্যাংককে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭টিতে।
শাখার সংখ্যা	১০,১১৪	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে দেশে কার্যকর ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল মোট ৬,৮৮৬টি। গত দশ বছরে ৩,২২৮ টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের শাখা শহরে ৫,২২৪টি এবং গ্রামে ৪,৮৯০টি।
ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা	৯.৯ কোটি	– আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাব সংখ্যা ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ দাঁড়িয়েছে – ৯৩ লক্ষ ১৭ হাজার কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে – সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী আওতায় ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে- ◦ ভাতাভোগীদের জন্য ৪৭ লক্ষ ◦ অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২ লক্ষ ১ হাজার ◦ হিন্দু ধর্মীয় দুঃস্থ ব্যক্তি, কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় অতি দরিদ্র, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগী ও সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন শ্রমিকদের জন্য ২৪ লক্ষ ৯৪ হাজার। – বিনা চার্জে দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও একশ টাকার বিনিময়ে ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৩ লক্ষ৮৬ হাজার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।
ব্যাংকের সঞ্চয় কার্যক্রম	১০৩৮৬৯৪.৪ কোটি টাকা	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ব্যাংকগুলোতে মোট সঞ্চয়/আমানতের পরিমাণ ছিল ২,৫২,৭৫৬ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট সঞ্চয়/আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,৩৮,৬৯৪.৪ কোটি টাকা।
মোট ঋণ ও আগাম	৮৪৭০১২.২ কোটি টাকা	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ২,১১,০৬৫ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৮,৪৭,০১২.২ কোটি টাকায়।
সরকারি খাতে ঋণ	১২৮৫১.৭ কোটি টাকা	জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি।
বেসরকারি খাতে ঋণ	৮৩৪১৬০.৫	জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি।
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২.৯ বিলিয়ন ডলার	৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে রিজার্ভ ছিলো ৫.৮ বিলিয়ন ডলার। গত দশ বছরে রিজার্ভ প্রায় ৬ গুণ বেড়ে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে দাঁড়িয়েছে ৩২.৯২ বিলিয়ন ডলারে। বর্তমান রিজার্ভ দেশের ৬.৫ মাসের আমদানি পরিশোধের জন্য যথেষ্ট।
মুদ্রামান (গড় ভারিত ডলার-টাকা রেট)	৮২.১ (জুন, ২০১৮)	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে টাকার মূল্যমান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বাজারভিত্তিক তদারকির কারণে বর্তমানে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

ব্যাংক খাত ঋণের মোট আগাম ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন

৩.২২ গত দশ বছরে বিভিন্ন খাতে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে, এছাড়া ঋণের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ✓ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০,৪০০.০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা হয় ২১,৩৯৩.৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৪.৯ শতাংশ;

চিত্র ৩.১ : ব্যাংক খাতে সেক্টরভিত্তিক ঋণ (কোটি টাকায়)

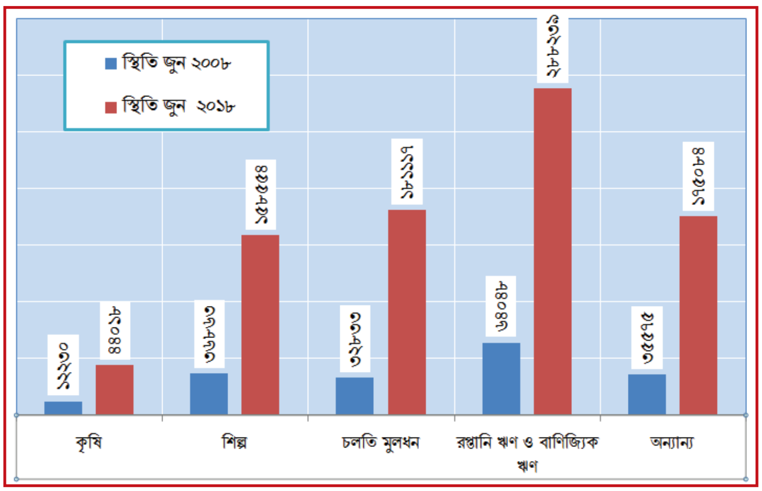

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ✓ ২০১৮ সালে এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১,৬১,০৩১.৯ কোটি টাকা। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৭৭,৫১৫.৩ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৪৮ শতাংশ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা ও বিশেষ কার্যক্রম

৩.২৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪টি, যার মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকানাধীন, ১২টি Joint Venture (দেশি-বিদেশি মালিকানাধীন) এবং ১৯টি দেশীয় মালিকানাধীন। সারাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যরত মোট শাখার সংখ্যা ২৬২টি। এসব প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহন, এসএমই, কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত অবস্থান নিম্নরূপ:

সারণি ৩.৭: আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ

	জুন, ২০১৮ভিত্তিক
ইকুইটি	১০৮২৫.৪৪
পরিশোধিত মূলধন	৭৯৭৩.৩৬
মোট সম্পদ	৮৭০২৯.৭৩
আমানত	৪৮০১০.৫২
পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ	১৮৫৫.৫৪
ঋণ ও লীজ	৬৪০৮০.৩৬
শ্রেণিকৃত ঋণ ও লীজ (মার্চ, ২০১৮)	৫৫৫৮.৭৬
বিরুপ শ্রেণিকৃত ঋণ ও লীজের হার (NPL) (মার্চ,২০১৮ ভিত্তিক)	৮.৮২%

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.২৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধনের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং তাদের ঋণ ঝুঁকি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ঋণ, সম্পদ-দায়, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসমুলক কার্যকলাপে অর্থায়ন প্রতিরোধসহ আর্থিক খাতের সার্বিক ঝুঁকি প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- ✓ ৫টি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন জারি;
- ✓ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে Guidelines on Products and Services, Stress Testing Guidelines, Guidelines on Base Rate System জারি;
- ✓ দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করা ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য Guidelines on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions প্রণয়ন;
- ✓ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে Diagnostic Review Report (DRR) প্রস্তুত করা;
- ✓ কমার্সিয়াল পেপার ইস্যু, বিনিয়োগ, Guarantor এবং Issuing and Paying Agent হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালনীয় বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে Guidelines on Commercial Paper for Financial Institutions জারি;
- ✓ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সততা, নৈতিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একটি Code of Conduct for Non-Bank Financial Institutions প্রণয়ন।

(খ) বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩.২৫ বর্তমান সরকারের আমলে অন্যান্য আর্থিক খাতের পাশাপাশি দেশের বীমা খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। লাইফ-ননলাইফ মিলে ৭৮টি বীমা কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত দেশের বীমা খাতের গুরুত্ব দিনে দিনে বাড়ছে। ১৯৩৮ সালের বীমা আইন রহিত করে

নতুন করে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ জারি করা হয়েছে। আইন দুটি জারির পর ২০১১ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ গঠনের পর থেকেই বীমা খাত ধীরে ধীরে গতিশীল হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ খাতের উন্নয়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং অর্জিত সাফল্য নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

- ✓ ১৯৭৩ সালের বীমা কর্পোরেশন আইনকে সময়োপযোগী করে নতুন ‘বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৮’ প্রণয়ন;
- ✓ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ✓ অভিবাসী বাংলাদেশীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনার জন্য প্রবাসী বীমা প্রকল্প চূড়ান্তকরণ;
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে স্কুল বীমা প্রকল্প চূড়ান্তকরণ;
- ✓ বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বীমা বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা।
    - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদের অধীনে ইতোমধ্যে পৃথক বীমা বিভাগ চালু করা হয়েছে;
- ✓ বীমা খাত সম্পর্কে সর্বসাধারণের ধারণা ইতিবাচক করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা;
- ✓ গতানুগতিক বীমা পলিসির বাইরে উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্ভাবনী পলিসি চালু করার জন্য কোম্পানিসমূহকে উৎসাহিত করা;
- ✓ বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বীমা দাবির চেক আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ✓ শুনানীর মাধ্যমে অপরিশোধিত বীমা দাবি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
- ✓ বিভিন্ন বীমা কোম্পানির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীমা কোম্পানিসমূহের পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রম মনিটরিং এর উদ্যোগ গ্রহণ;
- ✓ কোম্পানির সম্পদের সঠিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক সম্পদ বিবরণী দাখিল, বছর শেষে ব্যবসার হিসাব প্রতিবেদন দাখিল এবং জীবন বীমা কোম্পানিসমূহে একচ্যুয়ারিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি বীমা কোম্পানিতে একচ্যুয়ারিয়াল বিভাগ প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা প্রদান;
- ✓ এছাড়া স্বাস্থ্য বীমা চালুকরা, সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু করা এবং কৃষি পণ্যের জন্য ‘Weather Index Based Crop Insurance’ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

৩.২৬ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বীমা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

- ✓ বাংলাদেশের বীমা শিল্পের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রতি বছর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে বীমা শিল্পের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৭,৩৩৪ কোটি টাকা, যা ১৭৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৪৭,৩২২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে;
- ✓ বীমা খাতের মোট বিনিয়োগের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে বিনিয়োগ ছিল ১১২৮৪ কোটি টাকা, যা ১৯৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৩৩,৬১৪ কোটি টাকা হয়েছে;

- ✓ ২০০৯ সালে বীমা শিল্পের দাবি পরিশোধের পরিমাণ ১,০৯৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৫,৬৮১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে;
- ✓ বীমা শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে বীমা খাতে কর্মরত জনবল ছিল ১৬,৪৬২ জন, যা ১৬৭.৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালের ৪৪,০০০ জনে দাঁড়িয়েছে।

(গ) পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩.২৭ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
- দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠা;
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি-কে শক্তিশালী করার জন্য জনবল ও অন্যান্য সরঞ্জাম বৃদ্ধি;
- পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

আইনী সংস্কার (২০০৯-২০১৮)

- স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেনের অধিকার পৃথক করার লক্ষ্যে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন;
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ প্রণয়ন;
- Securities and Exchange Ordinance, 1969 সংশোধন;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংশোধন।

প্রণীত বিধি-প্রবিধানসমূহ

- Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭;

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৮;
- Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;
- Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015।

বিধি-প্রবিধান সংশোধন

- Securities and Exchange Rules, 1987;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫;
- Credit Rating Companies Rules, 1996;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;
- Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001;
- Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001;
- Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১৪;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015;
- ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩।

নতুন নীতিমালা প্রণয়ন

- সরকারি কোম্পানিসমূহের সম্পদ এবং দায় পুনঃমূল্যায়ন সংক্রান্ত;
- কোন ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক কোন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মকে ধারাবাহিকভাবে ৩(তিন) বছরের বেশি অডিটর হিসাবে নিয়োগ না করা বিষয়ক নীতিমালা;
- পাবলিক অফারের পূর্বে শেয়ারের প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শর্তাবলী বাধ্যতামূলকভাবে পরিপালন সংক্রান্ত নীতিমালা;
- আইপিও এর জন্য আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়ন বিষয়ক নীতিমালা;
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট গবেষণা এনডাউমেন্ট তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৭।

নতুন গাইডলাইন প্রণয়ন

- তালিকাভুক্ত কোম্পানির অডিটরদের প্যানেল তৈরির লক্ষ্যে গাইডলাইন;
- মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তরের গাইডলাইন;
- ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস্ ইস্যু সম্পর্কিত গাইডলাইনস;
- Eligible Investor দের জন্য গাইডলাইন;

- কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইন যুগোপযোগী করার জন্য সংশোধন করে নতুন কর্পোরেট গর্ভন্যান্স কোড প্রণয়ন।

প্রশাসনিক সংস্কার

- ইস্যুয়ার কোম্পানি যে পরিচালনা পর্ষদের সভায় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী গ্রহণ (adopt) করবে, ঐ সভাতেই কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য, শেয়ার প্রতি আয়, শেয়ার প্রতি নিট পরিচালন আয় ঘোষণার বিধান প্রচলন;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলককরণ;
- মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সর্বমোট মেয়াদ ১০ (দশ) বছর বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির গভর্ন্যান্স তদারকির উদ্দেশ্যে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ কর্তৃক Corporate Finance বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
- কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণ সম্মিলিতভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০% এবং প্রত্যেক পরিচালক কর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ২% শেয়ার নির্ধারণ;
- মার্চেন্ট ব্যাংকারসহ পুঁজিবাজারে নিয়োজিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারীসমূহের মূলধনের সর্বনিম্ন ৫১% প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহের বিধান প্রচলন;
- বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং অ-নিবাসী বাংলাদেশীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের উপর আরোপিত ১০% Capital Gains ট্যাক্স প্রত্যাহার;
- শেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যাংক এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অনুকূলে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংকের 'exposure to capital market' হিসেবে গণ্য না করা;
- পুঁজিবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগ উদ্ভুত কোন ক্ষতির জন্য প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে gain/loss net off করে provision সংরক্ষণের বিধান প্রচলন। উল্লেখ্য, পূর্বে শুধু net loss কে বিবেচনায় নেয়া হতো;
- শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এর ব্রোকারেজ কমিশন হিসেবে লেনদেন মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.১০% থেকে হ্রাস করে ০.০৫% নির্ধারণ;
- পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৯০০ কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল গঠন। ১৯-০৯-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৩৪টি মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে মোট ৩৫,৫২৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে ৮৯১.৯৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়;

চিত্র ৩.২: পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সুবিধা প্রদান

- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০.০০ (দশ) টাকায় রূপান্তর;
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে MoU স্বাক্ষর;
- পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বছরের (২০১২-২০২২) Master Plan প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়্যার (Surveillance Software) স্থাপন;
- Non-Discretionary Portfolio Management-এর ক্ষেত্রে অমনিবাস (omnibus) হিসাব এর প্রত্যেক গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান এবং তা বাস্তবায়ন;
- ডিএসই-তে এবং সিএসই-তে International Standard অনুযায়ী Free Float শেয়ারের হিসাবের ভিত্তিতে নতুন Index প্রবর্তন;
- রাইটস্ ইস্যুর ক্ষেত্রে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড পরিপালন বাধ্যতামূলককরণ;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন IOSCO এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করত: Appendix B হতে Appendix A-তে উন্নীতকরণ;
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Special Tribunal স্থাপন;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের রেজিস্টার্ড অফিস যে শহরে বা এলাকায় অবস্থিত সে স্থানে উহাদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলককরণ;
- বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশি বিনিয়োগসহ জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান;
- তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক নিরীক্ষকগণের প্যানেল প্রস্তুতকরণ;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ;

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (SEBI) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য পৃথক ইনভেষ্টরস্ এডুকেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ;
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি যুগোপযোগী বিধান প্রচলন;
- পিপিপি কোম্পানিকে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ও তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান;
- কোম্পানিসমূহের ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনয়ন, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন তথা পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা;
- বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে কোন লেনদেন হলে বিনা ফিতে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল ফোনে এসএমএস বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন;

চিত্র ৩.৩: BSEC এর নুতন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, ২০১৩

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা;
- দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে বিএসইসিতে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং ১০% (পূর্বে যাহা ৫% ছিল) বা এর বেশি শেয়ার ধারকদের ক্ষেত্রে লক-ইনের সময়সীমা ৩ (তিন) বছর এবং অন্যান্য শেয়ার ধারকের ক্ষেত্রে লক-ইনের সময়সীমা হল' ১ (এক) বছর নির্ধারণ;
- International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক নির্ধারিত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদযাপন;
- আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উহা প্রকাশের শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধানের প্রচলন;

- ইইএফ হতে ৮৮৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতে ১৪০০.৪০ কোটি টাকা এবং ১০১টি সফট্ওয়্যার শিল্পে ১২৬.২৩ কোটি টাকা, সর্বমোট ৯৮৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫২৬.৬৩ কোটি টাকা বিতরণ;
- বিআইসিএম কর্তৃক পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ৩৬ ক্রেডিটবিশিষ্ট ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম সান্ধ্যকালীন এক বছর মেয়াদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট চালুকরণ;
- পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিআইসিএম কর্তৃক এক থেকে ছয় সপ্তাহব্যাপী সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালনা;
- সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিনামূল্যে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রাম' এর আয়োজন। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ পুঁজিবাজার সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করছে।
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য ই-লার্নিং কার্যক্রম শুরু করা।

সারণি ৩.৮: পুঁজিবাজার খাতে (২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮) প্রধান প্রধান বাজার নির্দেশকসমূহের প্রবৃদ্ধি

বাজার নির্দেশক	২০০৮-০৯	২০১৭-১৮	প্রবৃদ্ধি%
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	১২৪১৩৩.৯০	৩৮৪৭৩৪.৭৮	২০৯.৯৪
বাজার লেনদেন (কোটি টাকায়)	৮৯৩৭৮.৯২	১৫৯০৮৫.১৯	৭৭.৯৯
শেয়ার মূল্য সূচক	৩০১০.২৬	৫৪০৫.৪৬ ডিএসই ব্রড ইনডেক্স	৭৯.৫৭
বৈদেশিক লেনদেন (কোটি টাকায়)	১১৮৩.৯২	১১৪১৬.২৪	৮৬৪.২৮
মূলধন সরবরাহ (কোটি টাকায়)	৪৫৭৯৪.৩৬	১২১৯৬৬.৫১	১৬৬.৩৪
বিও একাউন্টের সংখ্যা	১.৪০	২.৮০	১০০.০
বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৬০২	১৩৩২	১২১.২৬
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৪৪৩	৫৭২	২৯.১২
তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা	২৮২	৩০৫	৮.১৬
তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৭	৩৭	১১৭.৬৫
অ-তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	০১	৩৯	৩৮০০
তালিকাভুক্ত ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	৮	-
তালিকাভুক্ত ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	১৩৫	২২১	৬৩.৭০
তালিকাভুক্ত কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	১	১	-
বাজার মূলধন ও জিডিপি'র অনুপাত	২০.১৯%	১৭.১%	-১৪.৮৬

সূত্র: বিএসইসি

সারণি ৩.৯: পুঁজিবাজারে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

বাজার মধ্যস্থতাকারী	সংখ্যা
স্টক ব্রোকার (ডিএসই ও সিএসই)	৩৮৪
স্টক ডিলার (ডিএসই ও সিএসই)	৩৫২
ডিপজিটরী অংশগ্রহণকারী	৪৪০
সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি	৩৬
মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার	৬১
সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান	১৩
মিউচ্যুয়াল ফান্ড কাস্টডিয়ান	০৮
ট্রাস্ট্রি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ও অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড)	১৭
ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি	০৮
ফান্ড ম্যানেজার	১৩
মোট	১৩৩২

সূত্র: বিএসইসি

বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

সারণি ৩.১০: পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২৬	১,৪০৪
২.	প্রাত্যহিক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	২৮	১,০০৫
৩.	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	৩২৩	১২,৮২৬
৪.	বিভাগীয় কনফারেন্স	০৪	৫,২৮৬
৫.	অন্যান্য (বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৭ সংক্রান্ত কর্মসূচি)	০৮	২,৬৭৭
	মোট	৩৮৯	২৩,১৯৮

সূত্র: বিএসইসি

চিত্র ৩.৪: BSEC কর্তৃক IOSCO এর MoU স্বাক্ষর ২০১৪

চিত্র ৩.৫: BSEC এর Financial Literacy কার্যক্রমের উদ্বোধন, ২০১৭

পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগ অর্থায়ন

সারণি ৩.১১: কোম্পানি কর্তৃক আইপিও-র মাধ্যমে পুজিবাজার হতে মূলধন উত্তোলনের প্রতিবেদন

অর্থ বছর	আইপিও-তে অংশগ্রহণকারী নতুন কোম্পানির সংখ্যা	আইপিও এর মাধ্যমে প্রিমিয়ামসহ উত্তোলিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকা)	রাইট শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানির সংখ্যা	রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে প্রিমিয়ামসহ উত্তোলিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট মূলধন উত্তোলনের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০০৮-২০০৯	০৭	৮২.০	০৬	২৯২.১	৩৭৪.১
২০০৯-২০১০	১১	৯৮৫.৯	০৮	১০২৪.১	২০১০.০
২০১০-২০১১	০৬	৯২০.১	২৯	২৫৫০.৭	৩৪৭০.৮
২০১১-২০১২	১১	৮২৩.৭	১৪	১৮৩৭.৭	২৬৬১.৩
২০১২-২০১৩	১৪	৯৯৯.৪	০৬	১৬৬.৭	১১৬৬.১
২০১৩-২০১৪	১৭	৯০৫.৬	০৬	৭৪৮.১	১৬৫৩.৫
২০১৪-২০১৫	১৪	৯৭৫.২	০৪	১৩৫৪.১	২৩২৯.৩
২০১৫-২০১৬	০৮	৭০৩.৬	০৩	৩৬৫.৮	১০৬৯.৪
২০১৬-২০১৭	০৬	২২৯.৩	০৩	৯৮৯.৬	১২১৮.৯
২০১৭-২০১৮	১২	৫০৬.০	০৪	৪৯১.৫	৯৯৭.৫
মোট	১০৬	৭১৩০.৬	৮৩	৯৮২০.৩	১৬৯৫০.৯

(ঘ) ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)

৩.২৮ দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)'র সনদপ্রাপ্ত ৭০০টি প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংক, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ খাত দেশের পিছিয়ে পড়া প্রায় ৪.০০ কোটি মানুষকে আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের ঋণ স্থিতি ছিল ৮৮ হাজার ২৩ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি ছিল ৪৯ হাজার ৩ শত ১০ কোটি টাকা। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ছাড়াও এ খাতে ১.৫ লক্ষাধিক লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে শুধুমাত্র ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৮ শত ৫৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আর্থিক সেবার পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ খাত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেনিটেশনসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন সেবা তাদের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

৩.২৯ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী (যাদের শতকরা ৯১.১১ ভাগ মহিলা) ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছে। ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচিটি পিকেএসএফ ও সরকারেরর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগে ৬৪টি জেলায় ১৬৪টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়নে বিস্তৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১২.৪২ লক্ষ খানায় ৫৬.১৮ লক্ষ জনসংখ্যা উপকৃত হচ্ছেন। পিকেএসএফ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ হল-

- দারিদ্র্য দুরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito কর্মসূচি;
- OBA Sanitation Microfinance Program নামে একটি দিশারি প্রকল্পের মাধ্যমে বালাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১,৭০,০০০ পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান এর উদ্যোগ গ্রহণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;

- সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ;
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি ;
- Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) কর্মসূচি;
- Skills for Employment Investment Program (SEIP)
- সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি;
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি;
- নাগরিক সেবার উদ্ভাবন।

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

৩.৩০ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকতর সামাজিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচির (এসআইপিপি-২ এবং এনজেএলআইপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ হল-

- ২২টি জেলার মোট ৫,৬৪২টি গ্রামে ১০.৮২ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মধ্যে প্রায় ১০.৭০ লক্ষ পরিবারকে সুসংগঠিত করে নতুন জীবনদলে অন্তর্ভুক্ত করা;
- আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ৭.৫০ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে মোট ১৮৭৪.৭৪ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদান (ঋণ সংখ্যা ১৩.০ লক্ষ);
- ৪৭,৫৫০টি দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারকে মোট ২৩.১৭ কোটি টাকা এককালীন অনুদান হিসেবে প্রদান, যার মধ্যে ৪৩,৬৭৩ (৯২%) পরিবার আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ শুরু করেছেন;
- মোট ৭২,১৪৩জন বেকার যুব'কে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৫,৭৯১ জনের (৯১%) কর্মসংস্থান হয়েছে;
- গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩২২৭ কিলোমিটার রাস্তা, ৬,১৪৩টি কালভার্ট, ১৩,৩৯৮টি নলকুপ এবং ৩,০৪৩টি গ্রাম সমিতির অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে;
- পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র খানায় ১,৯১,৫৮০টি হাত ধোয়া স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে ও ৪.২৩ লক্ষ খানায় পুষ্টি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২,৫০০ গ্রাম সংগঠনকে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ):

৩.৩১ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানায় অলাভজনক কোম্পানি হিসেবে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট

খাত যথা সড়ক, ড্রেন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন, অফিস ভবন, কমিউনিটি সেন্টার, বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পাবলিক টয়লেট, কিচেন মার্কেট ও কসাইখানা নির্মাণসহ সড়কবাতি স্থাপন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অর্থায়ন করছে। এছাড়াও বিএমডিএফ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের আয়বর্ধন, হিসাব সংরক্ষণ, বাজেট প্রস্তুতকরণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ, লোকবল নিয়োগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিএমডিএফ ৭৯টি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ৫৬১.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৯ টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

সারণি ৩.১২: গত ১০ বছরে বিএমডিএফ আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত পূর্ত কাজ

ক্র. নং	কাজের ধরন	বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
আয়বর্ধক অবকাঠামো নির্মাণঃ			
০১	পৌর কাঁচাবাজার/মিউনিসিপল মার্কেট	৭২টি	৩৪ টি পৌরসভায়
০২	বাস/ ট্রাক টার্মিনাল	০৬ টি	০৬ টি পৌরসভায়
০৩	কম্যুনিটি সেন্টার	১৪টি	১২ টি পৌরসভায়
০৪	কসাইখানা	০৪টি	০৪ টি পৌরসভায়
০৫	পৌর পাবলিক টয়লেট	৫৫টি	১৯ টি পৌরসভায়
০৬	পানি সরবরাহ লাইন	১৩৪ কিঃমিঃ	১৩ টি পৌরসভায়
০৭	গভীর নলকুপ	০৮টি	০২ টি পৌরসভায়
জনস্বার্থ মূলক অবকাঠামো নির্মাণঃ			
০৮	রাস্তা/সড়ক উন্নয়ন	৩২০.৫ কি.মি.	১৫ টি পৌরসভায়
০৯.	ড্রেন	৩৯.৯ কি.মি.	০৯ টি পৌরসভায়
১০.	সড়ক বাতি	১৯৭৬টি	০৩ টি পৌরসভায়
১১.	পৌর অফিস বিল্ডিং	০১টি	০১ টি পৌরসভায়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

৩.৩২ এনজিওসমূহের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সহায়তা, পরিবেশ সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং পশ্চাদপদ বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এনজিওগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এ সকল কর্মসূচির অধীনে প্রায় ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার পরিবারের ৬০,৭১,০০০ জন নারী এবং ৩৫,৭৯,০০০ জন পুরুষসহ মোট ৯৬,৫০,০০০ জন (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। এছাড়া, ৬০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এনজিওগুলো মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ পর্যন্ত ১২২.১৯ কোটি টাকা (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩.৩৩ আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নিয়মিত যে সব নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করে আসছে তার মধ্যে আছে-

- ✓ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, বীমা কর্পোরেশন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বহিঃনিরীক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তি;
- ✓ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপনের অপেক্ষায় কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর সংকলনভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনসূহে আলোচিত অডিট আপত্তির হালনাগাদ জবাব সংশ্লিষ্ট বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং উক্ত নির্দেশনা পরিপালনে তদারকি;
- ✓ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নীতি নির্ধারণীমূলক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিস্পন্ন অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহের অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান;

(চ) বিশেষায়িত ব্যাংক/কর্পোরেশন এর কার্যক্রম

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

৩.৩৪ পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঞ্চয় ও অর্জিত অর্থ লেনদেন ও রক্ষণাবেক্ষণ ,ঋণ ও অগ্রিম প্রদান এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গত ২২ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সারাদেশে একযোগে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০টি শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ অবশিষ্ট ৩৮৫টি শাখাসহ ৪৮৫টি শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

৩.৩৫ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে বাংলাদেশীদের সহায়তা করার জন্য ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। সৃষ্টি লগ্নে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল একশত কোটি টাকা যা বর্তমানে চারশত কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

৩.৩৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে। তফসিলি ব্যাংকের সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শাখা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং দ্রুত ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় রেমিট্যান্স আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৩ টি শাখা রয়েছে। এ সকল শাখার মাধ্যমে ব্যাংকের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ২৮,৮৬৭ জন বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীকে ৩০০.০১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯২%।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৩.৩৭ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) আবাসন খাতে একমাত্র বিশেষায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাড়ি ও ফ্ল্যাট নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য যথাক্রমে ৯% ও ১০% এবং দেশের অন্যান্য সকল এলাকায় যথাক্রমে ৮.৫০% ও ৯% হারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, দেশের সকল জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য ৭টি নতুন প্রোডাক্ট যেমন: (১) প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবাস বন্ধু নামে আবাসন ঋণ কর্মসূচি; (২) পল্লী জনগণের জন্য পল্লীমা আবাসন ঋণ কর্মসূচি; (৩) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার নাগরিকদের জন্য নগর বন্ধু নামে আবাসন ঋণ কর্মসূচি; (৪) অসমাপ্ত বাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য আবাসন উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি; (৫) নির্মিত বাড়ি/ফ্ল্যাট উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য আবাসন মেরামত ঋণ কর্মসূচি; (৬) কৃষকদের উন্নত আবাসন ও কৃষি জমি রক্ষার জন্য কৃষক আবাসন ঋণ কর্মসূচি; এবং (৭) ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট নিবন্ধনের জন্য ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাহক সৃষ্টি ও ঋণ প্রদানে সহায়তাসহ মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(ছ) আর্থিক প্রণোদনা

- ✓ বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে ৯০৫.০৮ কোটি টাকা সুদ ভর্তুকী হিসেবে প্রণোদনা প্রদান;
- ✓ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের মেয়াদোত্তীর্ণ (শ্রেণী বিন্যাসিত) অনধিক ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত মূল কৃষি ঋণের সুদ থেকে দায়মুক্তির জন্য ১০৪.৯২ কোটি টাকার সুদ ভর্তুকী ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান;
- ✓ সমবায়ী কৃষকদের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ সুবিধার আওতায় মওকুফজনিত সুদ ভর্তুকী বাবদ ৪২৫.৫৫ কোটি টাকা ২০১১-১২ অর্থবছরে হতে এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান;

(জ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্ভাবণী কার্যক্রম

৩.৩৮ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থায় (মাঠ কার্যালয়সহ) প্রায় ৪০০টি ইনোভেশন টিম গঠন-পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমসমূহ আইটি ও নন আইসিটি কর্চারীগণের সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভাবনী কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতে অধিকতর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মধ্যে আছে-

- ✓ 'বিদেশ ভ্রমণ আদেশ জারি সহজীকরণ' ও 'ডিজিটাল কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক ২টি উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- ✓ অনলাইনে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদান;
- ✓ সোনালী ব্যাংকের Direct Cash Service, জনতা ব্যাংকের Janata Bank Green Communication, রুপালী ব্যাংকের শিওর ক্যাশ সিস্টেমে উপবৃত্তি প্রদান এবং হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের লোন ক্যালকুলেটর;
- ✓ জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক "Insurance Claim Payment Service System Through Cellphone" উদ্যোগ।